শিল্প ও সংস্কৃতি

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর পুনর্বাসন, স্বাধীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ফেরত পাঠানো, মাত্র দশ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান প্রণয়ন এ সবই বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

শিল্প ও সংস্কৃতি

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

মঞ্জুর আহমদ
তানজিল ফাতেমা
ড. মোঃ কামালউদ্দিন খান
শেখ নিশাত নাজমী
কামরুল হাসান ফেরদৌস
মোঃ রেজওয়ানুল হক
মুহাম্মদ রাশীদুল হাসান শরীফ
তানজিনা খানম
সুলতানা সাদেক

সম্পাদনা

অধ্যাপক নিসার হোসেন
মঞ্জুর আহমদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২২
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ ও প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

রিকশা পেইন্টিং

সৈয়দ আহমাদ হোসেন
রফিকুল ইসলাম

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অর্ন্তবর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

আমাদের মনের সুন্দর চিন্তাগুলোকে যখন আমরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করি তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। আমাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, খাবারদাবার, আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান, পোশাক, শিল্প সবকিছু নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভুবনজোড়া সংস্কৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একইসঙ্গে আমাদের অনুভূতিগুলোকে আঁকা, গড়া, কণ্ঠশীলন, অঙ্গভঙ্গি, লেখাসহ নানা রকমের সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারব।

বইতে অভিজ্ঞতাগুলো সাজানো হয়েছে ঋতু-প্রকৃতি এবং জাতীয় ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে। আমরা পাঠ শুরু করেছি আনন্দযাত্রার মধ্য দিয়ে। তাই প্রথম অভিজ্ঞতার নাম দিয়েছি 'আনন্দধারা'। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে যেহেতু শীত ঋতু তাই পরের অভিজ্ঞতাটি হয়েছে 'শীত প্রকৃতির রূপ'। ঋতুর এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে বছর জুড়ে। একইসাথে জাতীয় দিবসগুলোকে কেন্দ্র করেও অভিজ্ঞতা সাজানো হয়েছে।

রিকশা শিল্পীদের দীর্ঘ দিনের চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশে রিকশা শিল্প আজ একটি জনপ্রিয় শিল্পধারা হিসেবে সমাদৃত। ষষ্ঠ শ্রেণির 'শিল্প ও সংস্কৃতি' পাঠ্যবইয়ের প্রচ্ছদে এই শিল্পের আলংকারিক শৈলিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, লেখাসহ শিল্পকলার যে শাখায় স্বচ্ছন্দ্য বোধ করব, সে শাখায় ইচ্ছেমতো আমাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারব এবং শিল্পের আনন্দ উপভোগ করতে শিখব। এর চর্চার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন শিল্পকলায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারি, তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও সে নান্দনিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারি। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ গর্ব আর আত্ম-ত্যাগের সকল ইতিহাসকে জেনে অন্তরে ধারণ করে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখব 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়টির মধ্য দিয়ে।

সূচিপত্র

আনন্দধারা	১ - ৪
শীত-প্রকৃতির রূপ	৫ - ৯
পলাশের রঙে রাঙানো ভাষা	১০ - ১৪
স্বাধীনতা তুমি	১৫ - ২০
নব আনন্দে জাগো	২১ - ২৮
আত্মার আত্মীয়	২৯ - ৪০
বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে	৪১ - ৫২
শুধিতে হইবে ঋণ	৫৩ - ৬০
শরৎ আসে মেঘের ভেলায়	৬১ - ৭২
হেমন্ত রাঙা সোনা রঙে	৭৩ - ৭৯
বিজয়ের আলোয় সুন্দর আগামী	৮০ - ৮৭

আমাদের পৃথিবীটা কতই না সুন্দর! চারদিকে ছড়িয়ে আছে অনেক আনন্দ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। এই আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা শুরু করব প্রকৃতি পাঠ। আমাদের চারপাশে তাকালে দেখব প্রাকৃতিক নানা বিষয়বস্তু ও উপাদান, যেমন—আকাশ, বাতাস, পানি, মাটি, সূর্য, চাঁদ, তারা, নদী, পাহাড়, খাল, বিল, গাছপালা, ফুল, ফল, পশু, পাখি প্রভৃতি। এই সব প্রাকৃতিক উপাদান ও বিষয়বস্তু আমাদের সৃজনশীল কাজের প্রধান উৎস।

প্রকৃতির এই সব উপাদানের মধ্যে অন্যতম একটি হলো গাছ। তোমরা কি জানো গাছের অনুভূতি আছে? এটি আমাদের জানিয়েছিলেন বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ আমাদের শেখায় কী করে কষ্ট সহ্য করে অন্যকে সাহায্য করতে হয়। গাছ থেকে আমরা শিখি, শিকড়হীন হলে চলবে না। শিকড়ই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তেমনি আমাদের শিকড় হবে দেশীয় সংস্কৃতি। আমরা নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে আমাদের শিকড়কে শক্ত করব। সৃজনশীলতা দিয়ে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরব।

আমাদের চারপাশের প্রকৃতিতে রয়েছে অনেক রকমের গাছ। প্রতিটি গাছের ডালপালা, শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলের আকার-আকৃতি, গড়ন ও রং আলাদা। যেমন, আম গাছের সাথে পার্থক্য রয়েছে কাঁঠাল গাছের, তেমন পার্থক্য রয়েছে পলাশের সঙ্গে শিমুলের, বটের সাথে অশ্বত্থের। গাছের ভিতর দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায়, তার স্পর্শে গাছেরা শব্দ করে দুলে ওঠে। সে শব্দ আর দুলুনিতেও অনুভব করা যায় ভিন্নতা। এবার আমরা প্রকৃতির অংশ হিসেবে গাছ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেব।

এই অধ্যায়ে আমরা যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি—

আমরা পছন্দ মতো একটি গাছ নির্বাচন করব। আমাদের ভালোলাগার গাছটির ডালপালা, শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলের আকার, আকৃতি ও রং ইত্যাদি সকল দিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বকের সাহায্যে সতর্কতার সঙ্গে দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, অথবা স্বাদ, গন্ধ উপলব্ধি করে গাছটি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতি অর্জন করব।

আমরা কি জানি, শিল্পকলার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো শাখা, যেমন—চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য ইত্যাদি। প্রত্যেক শাখার রয়েছে নিজস্ব ধরন ও নিয়মনীতি। আমরা ভালোলাগার গাছ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা আর গভীর অনুভূতি পেলাম। এই অনুভূতিকে কল্পনার সাথে মিলিয়ে শিল্পকলার যেকোনো একটি পছন্দমতো শাখায় সহজভাবে প্রকাশ করতে পারি। এই নিয়ে সহপাঠীদের সাথেও আলোচনা করতে পারি।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- আমাদের ভালোলাগার গাছগুলোর একটি তালিকা তৈরি করব।
- গাছটি নিয়ে আমাদের ভাবনা নানাভাবে প্রকাশ করতে পারি। গাছ এঁকে অথবা পাতা এঁকে তাতে মনের মতো রং করতে পারি। বিভিন্ন রঙের কাগজ কেটে আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়ে পছন্দমতো গাছের কোলাজচিত্র তৈরি করতে পারি। গাছের পাতায় রং লাগিয়ে তার ছাপ নিয়ে মনের মতো নকশা তৈরি করতে পারি।
- গাছের পাতা, ফুল, শিকড়, ডালপালা, মাটি, বালিসহ নানা রকমের প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে মিলিয়ে মনের মতো বিভিন্ন আকৃতি দিতে পারি।
- আমাদের মধ্য থেকে কেউ গাছ নিয়ে তার পছন্দের গানটি গেয়ে শোনাতে পারি। আবার গাছের দুলুনিটি মজা করে নেচে অথবা অভিনয় করে দেখাতে পারি। কেউ নিজের ইচ্ছেমতো লিখতে পারি। কেউবা কোনো পছন্দের ছড়া বা কবিতা বলে গাছ সম্পর্কে নিজেদের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারি।

এবার নিজেদের পছন্দ মতো সাদা ও রঙিন কাগজ দিয়ে নকশা করে মলাট বানিয়ে একটি খাতা তৈরি করব। এই খাতায় আমরা আঁকব, লিখব। প্রয়োজন অনুসারে পত্রিকার অংশ, পাতা, ফুল ইত্যাদি যা যা পছন্দের-তা আঠা দিয়ে লাগিয়ে সংরক্ষণ করে রাখব। বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করা নাচ, গান সম্পর্কে লিখে রাখব। যা হবে আমাদের সবসময়ের বন্ধু। আমাদের এই খাতার নাম হবে ‘বন্ধুখাতা’।

বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এমনি অনেক স্কেচ খাতা ছিল, যাতে শিল্পী সবকিছু উল্টো করে লিখে রাখতেন। খাতার সেসব লেখা আয়নার সামনে রেখে সোজা করে পড়তে হতো। শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্পর্কে আমরা পরে আরও জানব। আমরাও চাইলে বন্ধুখাতায় এমন অনেক মজার মজার কাজ করতে পারি।

‘আনন্দধারা’ বিষয়টিতে নিজের অনুভূতি শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশের পর, আমরা শিক্ষকসহ সহপাঠীদের অনুভূতি ও মতামত জানতে পারি। অন্য সহপাঠীদের পরিবেশনের বিষয়ে সুন্দরভাবে নিজের অনুভূতি ও মতামত জানাতে পারি।

এই অধ্যায়ে আমি যা যা করেছি তা লিখি এবং আমার অনুভূতি বর্ণনা করি–

শীত প্রকৃতির রূপে

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন, আম্‌লকির এই ডালে ডালে—
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে, ঝরিয়ে দিলো তালে তালে

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শীত মানেই পাতা ঝরার গান। শীত আসার আগে যে গাছগুলোকে আমরা অসংখ্য সবুজ পাতায় ভরা দেখেছিলাম, শীতের আগমনে সে গাছগুলোর সবুজ পাতা ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। শুকিয়ে হয়ে যায় ধূসর রঙের। এটি প্রকৃতিতে শীতের একটি রূপ। এই সময় কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে যায় চারদিক। ঘাসের উপর পড়ে থাকে শিশির বিন্দু। ভোরের প্রথম সূর্য আলো ছড়ায়। তার সাথে প্রকৃতিতে বুলিয়ে দেয় উষ্ণতার পরশ। এই সময় সূর্যের মতো উষ্ণতা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরাও সকলকে জড়িয়ে রাখি ভালোবাসার উষ্ণতায়।

শীতের সময় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শীতের দেশের পাখিরা এসে ভিড় করে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এদের অতিথি পাখি বলে। অতিথি পাখিদের ভিন্ন ভিন্ন আকার, আকৃতি, রং, বিভিন্ন রকমের সুর আর ভঙ্গি দেখে মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এদের ভালোবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাটাও আমরা শিখি শীতের প্রকৃতির কাছ থেকে। তোমরা কি শীতের পিঠা-পুলি, খেজুরের রস খেয়েছ? শীতের সময় ঝরে পড়া শুকনো পাতার উপর দিয়ে হেঁটেছ? শুকনো পাতার উপর দিয়ে হাঁটলে তৈরি হয় এক ছন্দময় শব্দ।

এই সময় পাতাহীন গাছের ডালপালাগুলো দেখলে মনে হয় কোনো শিল্পী প্রকৃতি জুড়ে এঁকে দিয়েছেন আঁকাবাঁকা হাজার রেখা। সে আঁকাবাঁকা রেখার পেছনে কুয়াশা ঢাকা চাঁদটা যখন মাঝে মাঝে উঁকি দেয় তখন তাকে ঘিরে তৈরি হয় এক আলো-আঁধারের গল্প। শীত-প্রকৃতির এই রূপটি এবার আমরা 'আনন্দধারা'র দেখা গাছটির মধ্য দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করব।

এই অধ্যায়ে আমরা যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি-

- আমরা আমাদের গাছটির পূর্বের অবস্থার সাথে শীতের সময়ের পার্থক্যটা বোঝার চেষ্টা করব। পার্থক্যগুলো নিয়ে একটি নতুন তালিকা তৈরি করতে পারি।
- শুকনো পাতার উপর দিয়ে হাঁটা বা চলার অভিজ্ঞতা নেব। শুকনো পাতার যে ছন্দময় শব্দ হয় তা চাইলে বড়দের সহায়তা নিয়ে মোবাইলে বা মুঠোফোনে ধারণ করে রাখতে পারি।

আমরা শীতের প্রকৃতি এবং শীতের সময়ে ভালোলাগার গাছটি দেখে শীত সম্পর্কে বাস্তব ধারণা আর গভীর অনুভূতি পেলাম। যে নতুন তালিকা বা যা কিছু বন্ধুখাতার কাছে জমা রেখেছিলাম তা আমাদের কল্পনার সাথে মিলিয়ে পছন্দমতো শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় সহজভাবে প্রকাশের চেষ্টা করব। আমাদের এই ভাবনার প্রকাশ নিয়ে আমরা সহপাঠীদের সাথেও আলোচনা করব।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- গাছটি এঁকে/গাছটি সম্পর্কে লিখে/গাছের শুকনো পাতা, ছোট ডালপালা, রঙিন কাগজ কেঁটে/ছিঁড়ে তা দিয়ে কোলাজ তৈরি করব। কোলাজটি বন্ধুখাতায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে গাছটির শীতের সময়ের রূপকে তুলে ধরব।
- শীতের সময়ের বিভিন্ন রঙের ঝরা পাতা, শুকনো ডাল ইত্যাদি আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়ে শীতের গাছ/প্রকৃতি/পাখি ইত্যাদি বিষয়ে পছন্দমতো কোলাজচিত্র তৈরি করতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন রঙের ঝরা পাতা কেটে আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়ে আমরা আমাদের মনের মতো নকশা তৈরি করতে পারি।

- বিভিন্ন রকমের গাছের শুকনো পাতা, ফুল, শিকড়, ডালপালা, মাটি, বালিসহ নানা উপকরণ মিলিয়ে আমাদের মনের মতো বিভিন্ন কিছুর আকৃতিও বানাতে পারি।
- আমাদের মধ্য থেকে কেউ শীত নিয়ে তার পছন্দের গানটি গেয়ে শুনাতে পারি। কেউ কেউ শীতের অনুভূতি, শীতের গাছ, শীতের পাখি, শীতের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় নেচে অথবা অভিনয় করে দেখাতে পারি। কেউবা আবার শীত নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো লিখে অথবা কোনো পছন্দের ছড়া বা কবিতা বলতে পারি।

'শীত-প্রকৃতির রূপ' বিষয়টিতে নিজের অনুভূতি শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় প্রকাশের পর আমরা শিক্ষকসহ সহপাঠীদের অনুভূতি ও মতামত জানব। অন্য সহপাঠীদের পরিবেশনের বিষয়ে সুন্দরভাবে নিজের অনুভূতি ও মতামত জানাব।

এই অধ্যায়ে আমি যা যা করেছি তা লিখি এবং আমার অনুভূতি বর্ণনা করি–

পলাশের রঙে রাঙানো ভাষা

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে একটি হলো ছবির ভাষা। এই ছবির ভাষার পথ ধরে মানুষ নিজেদের ভাষা লিখে রাখার জন্য আবিষ্কার করলো বর্ণমালা। আবার কারো কারো ভাষা থেকে গেল মুখে মুখে। ভাষা হয়ে উঠল সভ্যতা আর সংস্কৃতির বাহন। আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা, আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম বাহন।

নিজেদের ভাষা আর সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়ত পৃথিবী জুড়ে সংগ্রাম করছে অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা তেমন একটি জাতি যারা নিজেদের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছি। ইতিহাসে ভাষা রক্ষার আন্দোলনের সে মাসটি ছিল পলাশের মাস, সে দিনটি ছিল বসন্তের দিন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঐ দিনটি ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি আর বঙ্গাব্দে ৮ই ফাল্গুন ১৩৫৮। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে সেদিনও গাছে গাছে ছিল সবুজ নতুন পাতা। প্রকৃতি সেজেছিল পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়ার রঙে। সেদিনের সে আগুনঝরা দিনে পাকিস্তানি শাসকের সকল বাধা অতিক্রম করে একদল তরুণ ঢাকার রাজপথে নেমেছিল মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্য। তখন পাকিস্তানি ঘাতকের বন্দুকের গুলিতে ঝরে গেল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেক তাজা প্রাণ। তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেলাম বাংলা ভাষা আর তাঁরা হলেন আমাদের ভাষা শহিদ।

ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান আর ভালোবাসা প্রকাশের জন্য তৈরি হয় শহিদ মিনার। দিবসটি হয় ‘শহিদ দিবস’। আবদুল গাফফার চৌধুরী রচনা করলেন কালজয়ী গান–

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

এই গানে প্রথমে সুর দিলেন আবদুল লতিফ এবং পরে সুর দিলেন আলতাফ মাহমুদ। ভাষার জন্য এই মহান আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে। জাতি হিসেবে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের আর সারা বিশ্বের সকল ভাষার মানুষের জন্য সম্মানের।

এই অধ্যায়ে যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি–

- দলবেধে প্রথমে দেখব এলাকার/বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের/অন্য কোনো মাধ্যমে শহিদ মিনার।
- দেখব শীতের সময়ে দেখা আমাদের ভালোবাসার গাছটি বসন্তে কেমন হলো। গাছের পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করে বন্ধুখাতায় লিখে রাখব।

এরপর আমরা পাতা ফুল সংগ্রহ করে দলবদ্ধভাবে একটি ফুলের তোড়া বানানোর পরিকল্পনা তৈরি করব। শহিদ দিবস উদযাপনের জন্য প্রভাতফেরির গান/নাট্যদৃশ্য/পোশাক-পরিচ্ছদসহ সকল পরিকল্পনা বন্ধুখাতার কাছে জমা রাখব। শহিদ দিবসে বানানো ফুলের তোড়া নিয়ে কিভাবে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করব এবং ভাষা শহিদদের সম্মান জানাব তার পরিকল্পনা করব।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- পরিকল্পনা অনুসারে সবাই মিলে জোগাড় করা ফুল আর পাতা দিয়ে ফুলের তোড়া তৈরির কাজ শুরু করব। তাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য রং, রঙিন কাগজসহ বিভিন্ন রকমের সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করব।
- শহিদ দিবসকে উপলক্ষ্য করে গান/নাট্যদৃশ্য/ছড়া/কবিতা/পোশাক-পরিচ্ছদসহ সকল বিষয়কে সৃজনশীল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করব।

এরপর সকলে মিলে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরির গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'- গেয়ে খালি পায়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শহিদ মিনারে নিজেদের তৈরি করা ফুলের তোড়া দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান জানাব।

নিজেদের করা নাট্যদৃশ্য/ছড়া/কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা ভাষা অন্দোলনের সকল ভাষা শহিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব। আমাদের দেশের সকল জাতিসত্তার মানুষের ভাষাসহ পৃথিবীর সকল মায়ের ভাষার প্রতি জানাব অনন্ত ভালোবাসা।

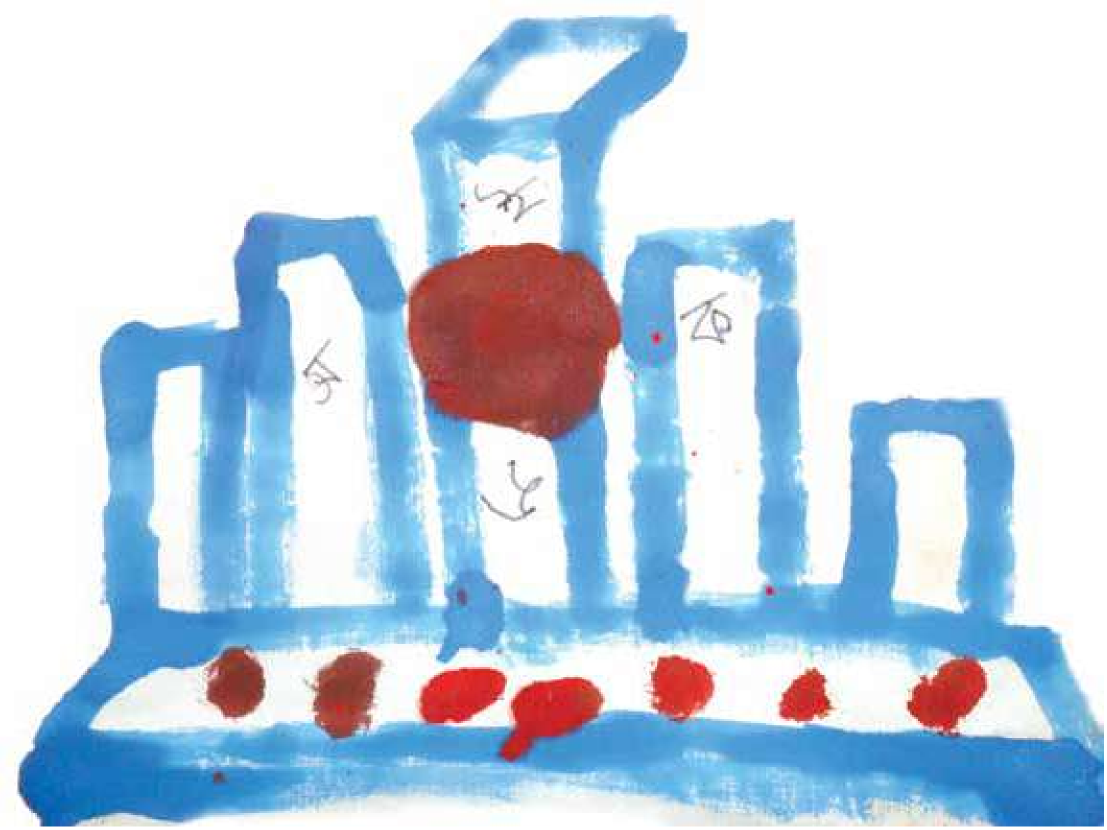

এই অধ্যায়ে আমি যা যা করেছি তা লিখি এবং আমার অনুভূতি বর্ণনা করি–

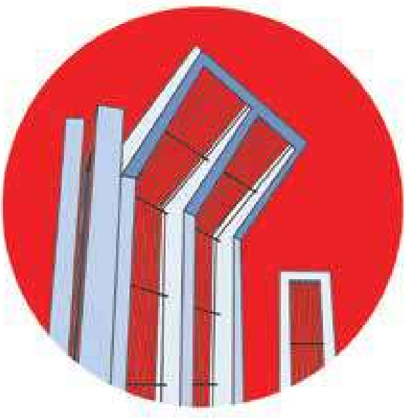

স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

– শামসুর রাহমান

কবি যেন স্বাধীনতাকে বোঝাতে যেমন ইচ্ছে লেখা, আঁকা-আঁকি করা আর যত্ন করে আগলে রাখা 'বন্ধুখাতা'র কথাটিই বলেছেন। আমরা কেউ আঁকতে পছন্দ করি, কেউ গাইতে, কেউ নাচতে বা অভিনয় করতে, কেউবা আবার লিখতে পছন্দ করি।

কেউ যদি পছন্দের এসব কাজে বাধা দেয় তখন আমাদের খুব খারাপ লাগে। –আমাদের মনে হয় আমার সব অধিকার হারিয়ে ফেলেছি। ঠিক তেমনি করে পাকিস্তানিরা একদিন আমাদের ভাষার অধিকার, সংস্কৃতি চর্চার অধিকারসহ স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারটাও কেড়ে নিতে চেয়েছিল। তখন পুরো জাতিকে স্বাধীনতার দিক-নির্দেশনা দেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন–
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এরপর বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির উপর। হত্যা করে অগণিত নিরপরাধ মানুষকে। সংঘটিত হয় মানব ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা। স্বাধীনতার ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শহিদ হন ত্রিশ লাখ মানুষ। নির্যাতনের শিকার হন লাখো নারী। বিনিময়ে আমরা পাই আমাদের নতুন দেশ, নতুন পতাকা, নতুন মানচিত্র এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। যাঁদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি সেই সব সূর্য সন্তানদের স্মরণে তৈরি করা হয়েছে 'জাতীয় স্মৃতিসৌধ'। যার স্থপতি হলেন সৈয়দ মাইনুল হোসেন।

স্মৃতিসৌধটি সাতটি ত্রিভুজাকৃতির দেওয়াল নিয়ে গঠিত। দেওয়ালগুলো ছোট থেকে বড়ক্রমে সাজানো হয়েছে। এই সাতটি দেওয়াল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাতটি ধারাবাহিক পর্যায়কে নির্দেশ করে। এগুলো হলো ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ এর শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ।

আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। আমরাও এবার সব সহপাঠীরা সমানভাবে ১১টা দলে বিভক্ত হয়ে যাব। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ১১টি সেক্টরের সংখ্যানুসারে নিজেদের দলের নামকরণ করব।

তারপর বাংলাদেশের একটি মানচিত্র সংগ্রহ করে বা এঁকে তাতে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ১১টি সেক্টরকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। এতে আমরা জানতে পারব বর্তমানে আমাদের এলাকাটি মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন সেক্টরের অধীনে ছিল।

এই অধ্যায়ে যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি–

- প্রত্যেকটি দল নিজেদের মতো করে আশেপাশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলব। পরিবার ও এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার চেষ্টা করব। এ সাক্ষাৎকারগুলো আমরা মোবাইলে ধারণ করে রাখব বা লিখে রাখব।
- তাছাড়া বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের বই, পত্রিকা সংগ্রহ করে তা থেকেও আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার চেষ্টা করব।
- তারপর ১১টা দল নিজেদের সংগ্রহ করা তথ্যের সাথে আঁকা ছবি, ছড়া, নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, লেখা ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে প্রকাশের পরিকল্পনা করব।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আমরা প্রত্যেকটি দল তালিকা তৈরি করে বন্ধুখাতায় জমা করে রাখব।
- প্রত্যেকটি দল মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাস সম্পর্কে নিজেদের চিন্তামতো ছবি এঁকে তাতে মনের মতো রং করতে পারি। বিভিন্ন রঙের কাগজ, পত্রিকা, ছবি কেটে আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়ে পছন্দমতো কোলাজচিত্র তৈরি করতে পারি।
- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত গান, নাচ, ছড়া, কবিতা বা গল্প লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।
- প্রত্যেক দল চাইলে মাটি, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধের কাঠামো গড়তে পারি। স্বাধীনতা দিবসের সাথে সম্পর্কিত অন্য যেকোনো কিছু গড়ে উপস্থাপন করতে পারি।

এবার ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে আমরা সব দলের তৈরি করা শিল্পকর্মগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করব। প্রত্যেকটি দল নিজেদের পরিকল্পনা মতো স্বাধীনতার গান, নাচ, নিজেদের তৈরি করা নাটিকা, কবিতা বা ছড়া পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবসে সকল বীর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাব।

এই অধ্যায়ে আমি যা যা করেছি তা লিখি এবং আমার অনুভূতি বর্ণনা করি—

নব আনন্দে জাগো

চৈত্র মাসের শেষ দিনে সূর্যাস্তের সাথে পুরাতন বছরকে আমরা বিদায় জানাই। এটি চৈত্রসংক্রান্তি বা বর্ষবিদায় অনুষ্ঠান। হালখাতার মধ্য দিয়ে, বৈশাখের প্রথম দিনের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে নতুন বছরকে আমরা স্বাগত জানাই। যাকে 'বর্ষবরণ' বলে। বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উৎসব যেন আমাদের প্রাণের উৎসব।

বাংলাদেশ নামের এই বাগানে রয়েছে অনেক জাতিসত্তা আর সম্প্রদায়ের মানুষ। যারা সবাই এই বাগানের হরেক রকমের ফুল। এদেশে বিভিন্ন জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উৎসব পালন করে থাকে।

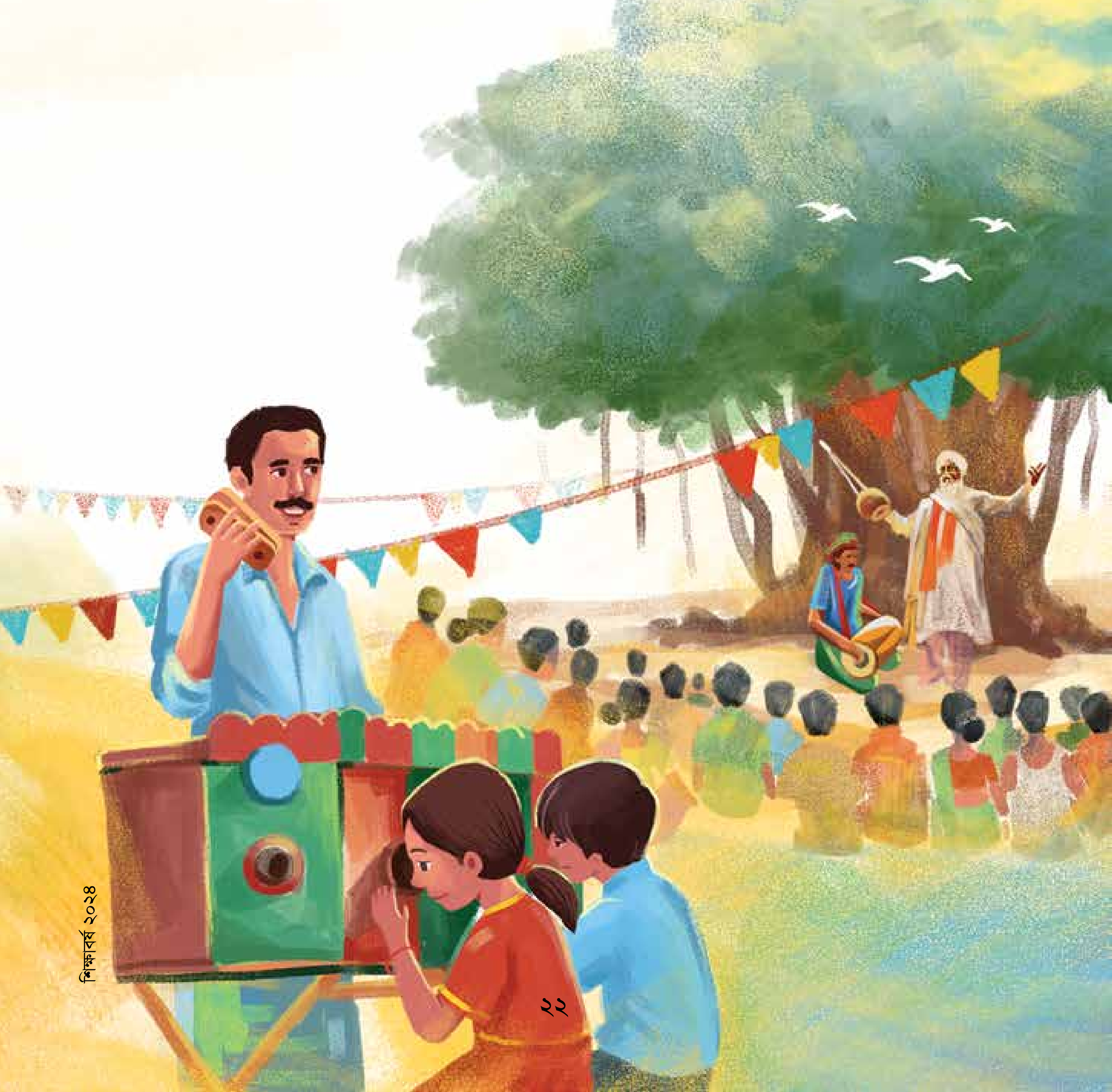

পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে শহরে ও গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী মেলা। সেসব মেলাকে উপলক্ষ্য করে লোকশিল্পীরা অনেক ধরনের লোকশিল্প সামগ্রী তৈরি করে যেমন— মাটির পুতুল, শখের হাঁড়ি, পাটের শিকা, নানা রকমের খেলনা, শীতলপাটিসহ আরো অনেক কিছু। মিষ্টি, সন্দেশ, মোয়া, মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, নাড়ু প্রভৃতি খাবার বৈশাখী মেলার আয়োজনকে করে তোলে আনন্দময়।

এছাড়া আয়োজন করা হয় যাত্রাপালা, সার্কাস, বাউলগান, লোকনাটক, পুতুলনাচ ও গানের অনুষ্ঠান। এসবই আমাদের সংস্কৃতির অমূল্য অংশ, যা সংরক্ষণ করা আমাদের দেশ ও জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই লোকশিল্পই হলো আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির শিকড়। 'বর্ষবরণ' আমাদেরকে শেখায় নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে নতুন আনন্দে জেগে উঠতে।

বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ এই দুটি মাসকে নিয়ে শুরু হয় প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে চারদিক যখন ক্লান্ত ঠিক তখন কালবৈশাখীর তীব্র ঝড়োহাওয়া প্রকৃতিতে শীতল পরশ বুলিয়ে দেয়। নতুন প্রাণ ফিরে পায় প্রকৃতি। গ্রীষ্মের উষ্ণতা আর বৈশাখী উৎসব এই দুটিকে মিলিয়ে এবার আমরা শ্রেণিকক্ষে আয়োজন করব 'হৃদোৎসব'।

এই অধ্যায়ে যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি–

- এই উৎসব আয়োজনের জন্য আমরা শ্রেণির সব বন্ধুরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাব। এবার পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে কী কী আচার, অনুষ্ঠান, খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি করব ও বন্ধুখাতায় সংরক্ষণ করব। তালিকা তৈরির সময় মা, বাবা, দাদা, দাদি, নানা, নানি, এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠজনের সাহায্য নেব।
- এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠজনসহ লোকশিল্পীদের সাথে কথা বলব। এই কথোপকথন আমরা সম্ভব হলে ধারণ করে রাখব বা লিখে রাখব। এই সব আলোচনা থেকে ঐতিহ্যবাহী ঘটনা বা লোকগাথা, লোকগান, নাটক, যাত্রাপালা, লোকছড়াসহ লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব।
- বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বইপত্র, ছবি, ভিডিও দেখে আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানব। জাতীয় আয়োজন সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তার তালিকা বন্ধুখাতায় সংরক্ষণ করব।
- এছাড়াও আমাদের পূর্বের দেখা গাছটির গ্রীষ্মকালীন অবস্থাটিও দেখে নেব।

এবার সংগৃহীত তথ্যকে ছবি আঁকা, গড়া, নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, লেখা ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে নেব। 'হৃদোৎসব' এর জন্য শ্রেণিসজ্জা, প্রদর্শন ও উপস্থাপনের পরিকল্পনা করব।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য কাগজ কেটে বা জোড়া লাগিয়ে তাতে ইচ্ছেমতো রং করে বিভিন্ন মুখোশ তৈরি করতে পারি। কাগজ ভাঁজ করেও আমরা অনেক মজার মজার আকার তৈরি করতে পারি। তাছাড়া নকশা করে কাগজ কেটে ঝালর তৈরি করে শ্রেণিকক্ষ সজ্জার আয়োজন করতে পারি।
- বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অথবা গ্রীষ্ম ঋতুকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ আঁকতে পারি। আমাদের মধ্যে যারা অভিনয় করতে আগ্রহী, তারা মিলে কোনো একটি লোকনাটকে অভিনয় করতে পারি।
- যারা সৃজনশীল লেখা, গান, নাচ, ছড়া, কবিতা পাঠ বা রচনা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের পছন্দমতো বিষয়ে অংশ নিতে পারি।

এবার 'হৃদোৎসব' এর নির্দিষ্ট দিনে আমাদের সাজানো শ্রেণিকক্ষে আমরা চিত্র ও সৃজনশীল লেখা তুলে ধরব। সাথে নিজেদের রচিত নাটক, গান, নাচ, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি পরিবেশন করব। 'হৃদোৎসব' এর মধ্য দিয়ে সবাই নিজেদের সংস্কৃতিকে যেমন ভালোবাসব তেমনি অন্য সংস্কৃতিকেও সম্মান জানাব।

কাগজ দিয়ে পাখি বানাই–

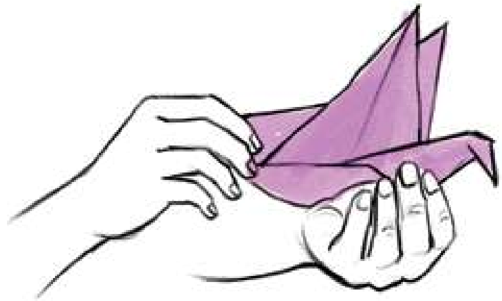

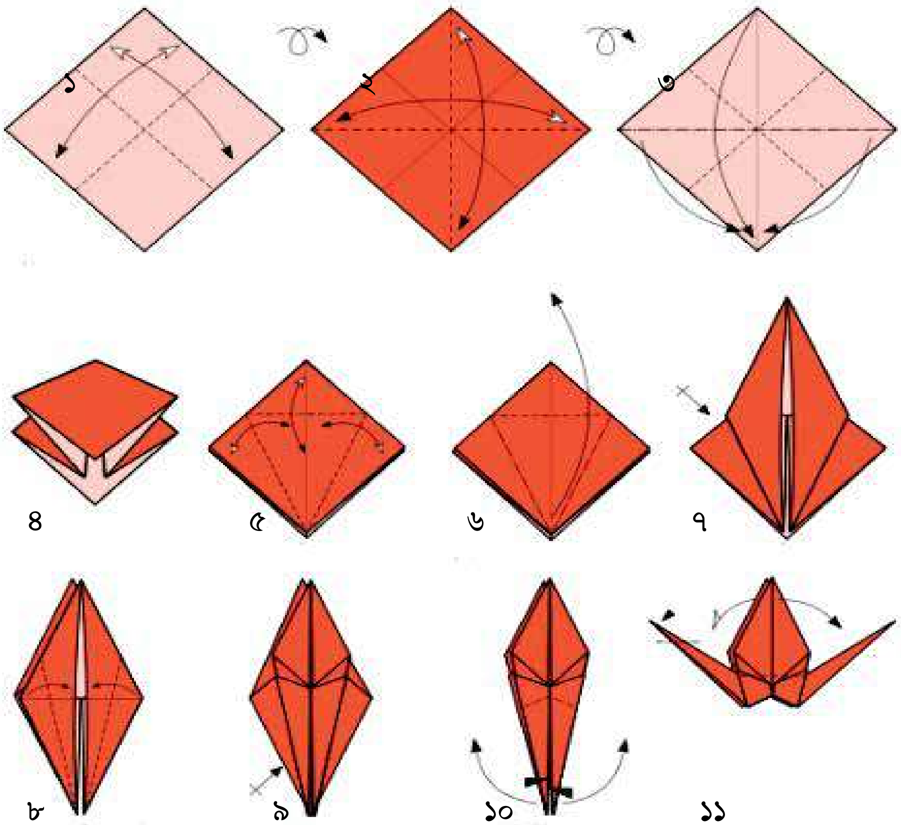

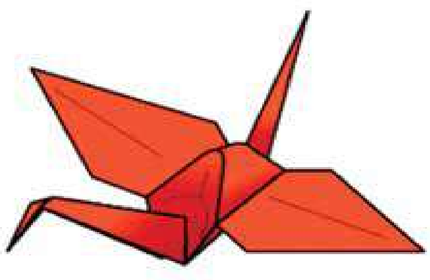

এই অধ্যায়ে আমি যা যা করেছি তা লিখি এবং আমার অনুভূতি বর্ণনা করি–

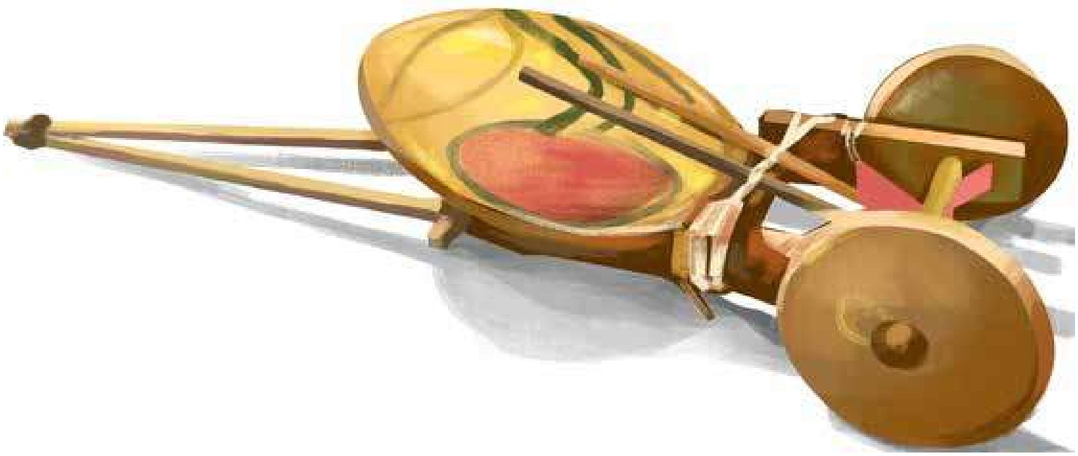

অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর সাথে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের বক্সে টিক চিহ্ন দিন–

- ☐ শিক্ষকের নির্দেশনার ভিত্তিতে কাজ করেছে।
- ☐ এই পাঠ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছে।
- ☐ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল কাজ করেছে।
- ☐ বাড়িতে নিজের কাজ গুছিয়ে করেছে।
- ☐ এই পাঠে --- চর্চা করেছে।
- ☐ এই পাঠে শিক্ষার্থী যে বিষয়টি রপ্ত করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করেছে/ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করেছে।

অভিভাবকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর: তারিখ:

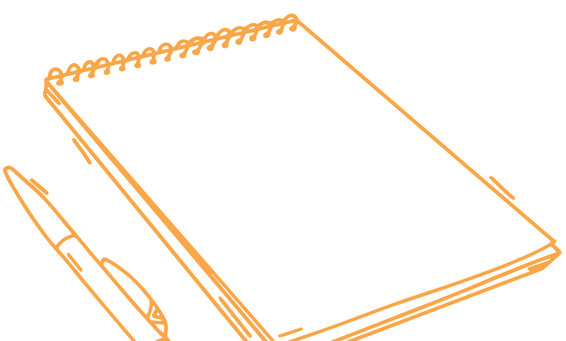

আমার আত্মীয়

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
“কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।”
বাবুই হাসিয়া কহে, “সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই পরের বাসা,
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।”

—রজনীকান্ত সেন

রঙবেরঙের পাখিতে ভরা এই পৃথিবী। তাদের কোনোটি নীল কোনোটি লাল কোনোটি হলুদ আবার কোনোটি মিশেল রঙের। তাদের আকার আকৃতিতেও রয়েছে ভিন্নতা। তাছাড়া প্রত্যেকটি পাখির কণ্ঠস্বর বা ডাকও আলাদা আলাদা। কোনো পাখি কোমল তো কোনোটি কর্কশ স্বরের। পাখিদের ভঙ্গির কথা আর কী বলব! কোনোটির চলনে রাজসিক ভঙ্গি তো কোনোটির দুষ্টুমিতে ভরা। এ যেন প্রকৃতি জুড়ে আকার, আকৃতি, রং, স্বর, সুর আর হরেক রকমের ভঙ্গির মেলা!

আমরা তো জানি, আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েল। জানা আছে কি? কোন পাখিটিকে তাঁতি পাখি বলা হয়? নিপুণ বাসা গড়ার কারিগর বাবুই পাখিকে বলা হয় তাঁতি পাখি ।

'বাবুই' খুব পরিচিত একটি পাখি। অনেকেই এদের 'বাউই' বলেও ডাকে। সাধারণত তাল, খেজুর, নারকেল কিংবা সুপারি গাছের পাতায় এদের গড়া সুনিপুণ বাসাগুলো দুলতে দেখা যায়। বছরের বিশেষ সময়ে বাবুই পাখিদের ভীষণ সুরেলা কণ্ঠেও ডাকতে শোনা যায়। এদেরকে তাই গায়ক পাখিও বলা যেতে পারে। এদের ওড়াউড়ি, দলবেঁধে থাকা, টুকটুক করে খাওয়ার দৃশ্য এবং বাচ্চাদের খাওয়ানোর ধরন— এসব দেখে আমরা বুঝতে পারি, নিজের তৈরি বাসা আর নিজের পরিবারের সাথেই তার আত্মার সম্পর্ক।

এই অধ্যায়ে যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি–

- প্রকৃতির মাঝে গিয়ে বিভিন্ন পাখির বাসা, তাদের বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি নানা বিষয় দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে অভিজ্ঞতা নিতে পারি।
- বাবুই পাখি সম্পর্কে জানতে প্রকৃতিতে তাদের বানানো বাসা খুঁজে দেখতে পারি।
- নিজ পরিবারের সদস্য, বাড়িতে প্রিয় স্থান, পোষা প্রাণী, গাছ-পালা, খুব প্রিয় কোনো বস্তু সম্পর্কে নিজের ভাবনা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতে পারি।
- নিজের ভাবনাগুলোকে কল্পনার মিশেলে তুলে ধরতে শিল্পকলার উপাদান সম্পর্কে জানতে পারি।
- সম্ভব হলে উপরের অভিজ্ঞতাগুলো ভিডিওতে দেখতে পারি।

বাবুই পাখি দেখার এই অভিজ্ঞতাকে এবার নিজেদের পরিবারের সাথে একটু মিলিয়ে দেখতে পারি। প্রত্যেকেই আমরা কোনো একটি পরিবারের সদস্য। প্রতিটি পরিবারই তার সকল সদস্যের নিরাপদ আশ্রয়। বাবুই পাখির গড়া বাসা যেমন তার নিজের কাছে খাসা, তেমনি আমাদের ঘরগুলোও ছোট-বড় যেমনই হোক না কেন, ওটাই আমাদের কাছে সেরা।

এবার চলো একটি মজার কাজ করা যাক–

- বিভিন্ন রেখা ও আকার ব্যবহার করে আমরা একটা করে গাছ আঁকব, যার নাম দেব 'পরিবার বৃক্ষ'। একটি গাছে যেমন থাকে শেকড়, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল-ফল ইত্যাদি। তেমনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অর্থাৎ মা-বাবা, ভাই-বোন এবং আরো যাদের সাথে আমরা বসবাস করি তাদের সবাইকে গাছের বিভিন্ন অংশে বসাব।
- আমাদের পোষা প্রাণীগুলোও পরিবারের অংশ, আত্মার আত্মীয়। আমরা চাইলে আমাদের পোষা প্রাণীটিকেও এই পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

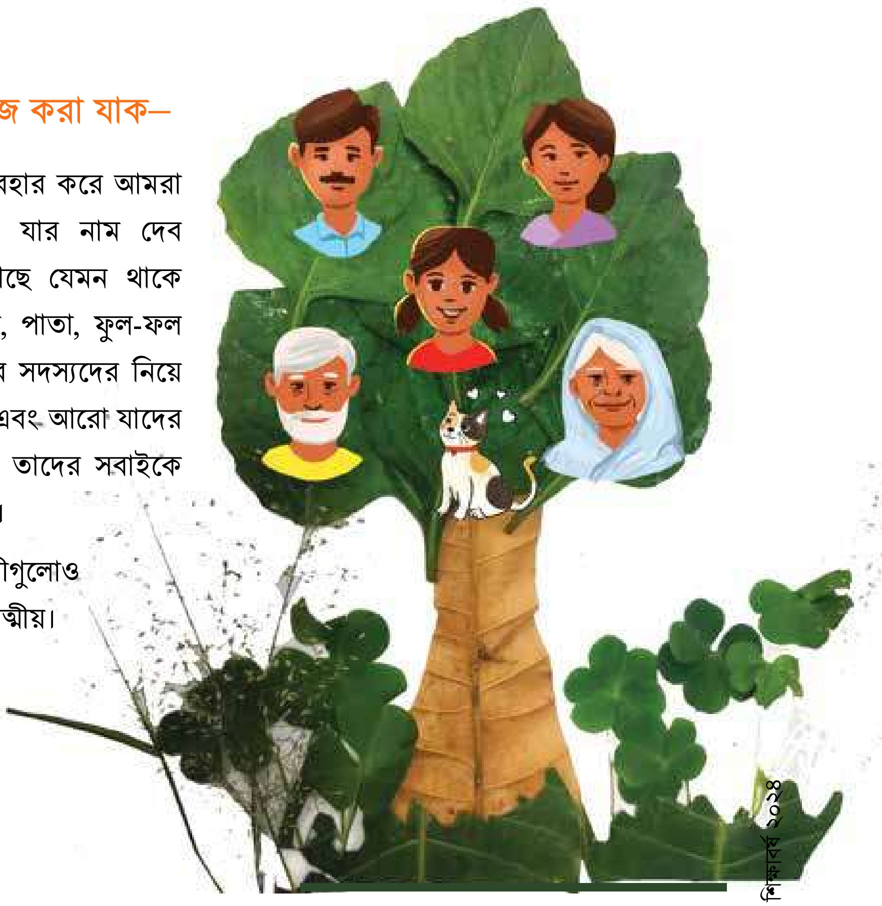

ইচ্ছেমতো পরিবার বৃক্ষ আঁকি

আমাদের শিল্পকলা পরিবার

মানুষের নান্দনিক ও সৃজনশীল কর্মকান্ড প্রকাশের শাখাসমূহকে একত্রে শিল্পকলা বলে। শিল্পকলার প্রধান দুটি শাখার একটি হলো দৃশ্যকলা, যার মধ্যে রয়েছে–চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি। আরেকটি পরিবেশনকলা, যার মধ্যে রয়েছে সংগীত, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি।এছাড়া শিল্পকলার আরো অনেক শাখা আছে যার সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আরও জানতে পারব।

শিল্পকলার শাখাগুলো আমাদের প্রকৃতির হরেক রকমের পাখির মতো। প্রকৃতির পাখিগুলো আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের হলেও সবাই যেমন পাখি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ঠিক তেমনি শিল্পকলার শাখাগুলোর ধরন ও উপাদান আলাদা হলেও এরা পরস্পরের আত্মার আত্মীয় এবং শিল্পকলা পরিবারের অন্তর্গত। বাবুই পাখির বাসা যেমন সুনিপুণভাবে গড়া তেমনি শিল্পকলার প্রতিটি শাখা স্বীয় উপাদান দিয়ে সঠিকভাবে বিন্যস্ত। পাখিরা যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তেমনি করে শিল্পকলার শাখাগুলো মানুষের নান্দনিকবোধকে জাগ্রত করে। নানা রকমের পাখি নিয়ে যেমন প্রকৃতির পাখি পরিবার, তেমনি শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা নিয়ে শিল্পকলা পরিবার। এ যেন পরিবারের গল্প।

ইচ্ছেমতো শিল্পকলা পরিবার আঁকি–

প্রথমে আমরা জানব ছবি আঁকার ভাষায় রেখা ও আকৃতি কাকে বলে

ছবি আঁকার মূল উপাদানগুলো হলো– রেখা, আকৃতি, গড়ন, রং, আলোছায়া, বুনট, পরিসর। এখন আমরা রেখা ও আকৃতি সম্পর্কে জানব। পরবর্তী সময়ে আমরা ছবি আঁকার অন্য উপাদানগুলো সম্পর্কেও জানব।

রেখা (Line): বিন্দুর গতিপথকে বলে রেখা। কোনো রেখা সোজা আবার কোনোটি হয় বাঁকা। সোজা রেখাকে বিভিন্নভাবে আঁকা যেতে পারে। যেমন– লম্বালম্বি, আড়াআড়ি, কোনাকুনি। আঁকাবাঁকা রেখাগুলোও বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন– কোনোটা হতে পারে ঢেউ খেলানো, কোনোটা খাঁজকাটা, আবার কিছু রেখা চক্রাকার– দেখতে অনেকটা গোল শামুকের মতো।

আকৃতি (Shape): রেখার ঘের দিয়ে তৈরি হয় আকৃতি যেমন–একটি রেখার এক প্রান্ত যখন অন্য প্রান্তকে স্পর্শ করে তখনই আকৃতি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আকৃতি হলো বাইরের রেখা বা সীমা রেখায় আবদ্ধ একটি রূপ। ছবিতে আকৃতিগুলো সাধারণত দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দ্বিমাত্রিক ভাবে আঁকা হয়, কোনো গভীরতা থাকে না। সাধারণভাবে আকৃতি দুই প্রকার, প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক। আকার বলতে বুঝায় কোনো বস্তু কতটা ছোট বা বড় তাকে। তবে সাধারন ও ব্যবহারিক বাংলায় আকার-আকৃতি শব্দ দুটোকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়।

গড়ন (Form): গড়া থেকে গড়ন, গড়ন হলো বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে অর্থাৎ বস্তুটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা/উচ্চতা মিলিয়ে যখন তার রূপটি তুলে ধরি তখন সেটা হয় গড়ন। আকৃতির মতো গড়নও প্রাকৃতিক এবং জ্যামিতিক দুই ধরনের হতে পারে। পরবর্তীতে আকৃতি ও গড়নের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা আরও জানব।

ফিরে আসা যাক বাবুই পাখি প্রসঙ্গে। শুরুতেই জেনেছিলাম বাসা বানানোর অসাধারণ দক্ষতার পাশাপাশি বাবুই পাখি তার সুরেলা ডাক বা কণ্ঠের জন্যও খুব সমাদৃত। আমরা কি জানি, বাবুই পাখির ডাক কেন আমাদের কাছে এত সুরেলা শোনায়? শুধু পাখির ডাকই নয়, প্রকৃতিতে এমন আরও অনেক শব্দ সুর হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়। বাতাসে মাঠের ফসল দোলার শব্দ, গাছের পাতার শব্দ, নদীতে বয়ে যাওয়া পানির শব্দ, এমন আরও কত কত শব্দ! তবে সব শব্দই সুর নয়, সুর সৃষ্টি হয় স্বরের মাধ্যমে। গান, বাজনা আর নাচ এই তিনের সমাহারকে বলা হয় সংগীত। যেকোনো সংগীতে মূলত দুটি বিষয় লক্ষ করা যায়। একটি হলো স্বর অন্যটি তাল।

এবার আমরা স্বর সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এবং পরবর্তী সময়ে সংগীতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানব।

স্বর: মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখির কণ্ঠ হতে অথবা পদার্থের আঘাতে যে আওয়াজ বা শব্দ বের হয় তাকে ধ্বনি বলে। আর গ্রহণযোগ্য শ্রুতিমধুর ধ্বনিকে সংগীতে স্বর বলে। সংগীতের মূল স্বর হলো ৭টি–

সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি । একাধিক স্বরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সুর ।

সংগীত, নাচ আর অভিনয় এরা পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। সংগীতের সাথে যেমন সম্পর্ক রয়েছে নাচের, তেমনি নাচের সাথে আবার মিল রয়েছে অভিনয়ের।

নাচ বলতে বোঝায় শরীরের ছন্দবদ্ধ নানা ভঙ্গি। নাচের কিছু উপাদান সম্পর্কে এবার জানব।

নাচের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হলো– চলন, রস, মুদ্রা, পোশাক ও সাজ-সজ্জা।

চলন: হাত, পা এবং শরীরের নড়াচড়া অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছন্দময় অবস্থান পরিবর্তনকে চলন বলে।

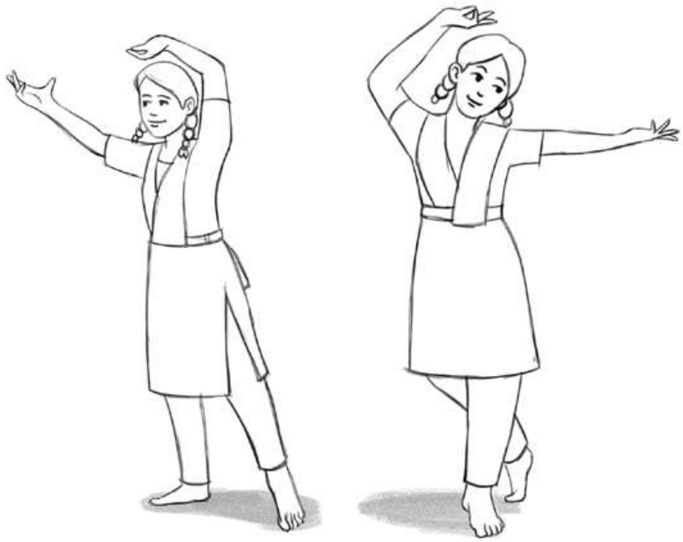

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- শুরুতেই যে ছড়াটি পড়েছি সেটা চাইলে সুর দিয়ে গাইতে পারি এবং তার সাথে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, হেলে-দুলে চড়ুই ও বাবুই পাখির কথোপকথন ফুটিয়ে তুলতে পারি।
- গৃহপালিত বা চারপাশের পরিবেশে দেখা বিভিন্ন জীব-জন্তুর অঙ্গভঙ্গি এবং গলার স্বরের অনুকরণ করেও অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাতে পারি।
- আমরা একটি ভিন্ন ধরনের কাজের পরিকল্পনা করতে পারি। হাতের আঙুলের আকারে ও মাপে পাপেট বানিয়ে অভিনয় করলে কেমন হয়, বলোতো? এই কাজটির নাম দিব 'পাঁচ আঙুলের ভুবন'।
- এই কাজটি করার জন্য শ্রেণির সব বন্ধু প্রয়োজনমতো কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাব।
- এরপর প্রতিটি দল প্রকৃতি থেকে পশু পাখির স্বর, চলন ভঙ্গিমা এবং বৈশিষ্ট্য সরাসরি পাওয়ার অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিশেলে একটি নাট্য ভাবনা লিখে ফেলব বন্ধুখাতায়।
- প্রত্যেকটি দলের মধ্যে কে কোন প্রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করব তারও একটি পরিকল্পনা করে নেব। গল্পের নির্ধারিত প্রাণীর চলন ও স্বরকে অনুকরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমরা অনুশীলন শুরু করব।
- এবার দলের প্রত্যেক সদস্য নিজের হাতের আঙুলের মাপে নির্ধারিত প্রাণীর গড়ন, আকৃতি তৈরি করব। গড়নগুলো কেমন হতে পারে তা আমরা কাগজে এঁকে দেখব।
- সেই অনুযায়ী কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে অথবা কাপড় কেটে সেলাই করে সহজেই আমরা এসব আকৃতি, গড়ন তৈরি করতে পারি। আকৃতি, গড়ন তৈরির বিষয়ে দলের প্রত্যেক সদস্য একে অপরকে সহায়তা করব।
- এবার নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণিকক্ষের টেবিলগুলোকে মঞ্চ বানিয়ে আমাদের হাতের আঙুলের সাহায্যে পাপেট শো বা পুতুল নাচ প্রদর্শন করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এই অধ্যায়ে ছবি আঁকা, গান, অভিনয় ও নাচের মধ্য হতে নিজের পছন্দের বিষয়ে আমি যা জানলাম তা লিখি–

বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে

আমি বর্ষা আসিলাম
গ্রীষ্মের প্রদাহ শেষ করি
মায়ার কাজল চোখে
মমতায় বর্মপট ভরি

—সুফিয়া কামাল

বৃষ্টির নূপুর পরে রিমঝিম শব্দে ছন্দ তুলে বর্ষা আসে প্রকৃতিতে। গ্রীষ্মের গরমে শুকনো প্রকৃতিতে বর্ষার জল নিয়ে আসে নতুন প্রাণ। গাছে গাছে গজায় নতুন পাতা। এ সময়ের সবুজ প্রকৃতির মনভোলানো রূপ নিশ্চয়ই দেখেছ মনোযোগ দিয়ে। চলো, নতুন করে আমাদের পূর্বে দেখা সে গাছটি অবলোকন করি, স্পর্শ করে দেখি এই বর্ষায়। সেই গাছটির মধ্য দিয়ে আমরা দেখার ও অনুভব করার চেষ্টা করি আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকে। বর্ষায় কী কী পরিবর্তন হয় প্রকৃতিতে তা এবার খুব মনোযোগ দিয়ে দেখব। জানব বর্ষার ফল, ফুল কোনগুলো। বর্ষায় খাল, বিল, নদী, পুকুরগুলো যখন পানিতে কানায় কানায় ভরে ওঠে তখন তা কেমন দেখায়।

এই অধ্যায়ে যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি–

- বর্ষার প্রকৃতি দেখে ছবি আঁকার বিভিন্ন উপাদান– আলো-ছায়া, আকার-আকৃতি, রং, পরিপ্রেক্ষিত এবং ছবি আঁকার পরিসর সম্পর্কে জানতে পারি।
- মেঘ, বৃষ্টি ও আকাশ দেখে, শুনে ও অনুভব করে প্রকৃতির মধ্য থেকেই সংগীত ও নৃত্যের নানা উপাদান–তাল, লয়, রস ও মুদ্রার ধারণা নিতে পারি।

বর্ষার আগমনে প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন অবিরাম জলতরঙ্গ বেজে চলে চারদিকে। বৃষ্টি প্রকৃতিতে তৈরি করে অপূর্ব সুর-মূর্ছনা। কখনো টিপটিপ করে ধীর গতিতে, কখনো মাঝারি গতিতে, কখনো দ্রুত গতিতে বা কখনো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে। আবার বর্ষার মেঘের বিজলি চমক আর গুরুগুরু শব্দে মেঘের ডাকে কম্পিত হয় চারদিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–

বাদল-মেঘে মাদল বাজে
গুরুগুরু গগন-মাঝে।

মাদল হলো ঢোল বা মৃদঙ্গের মতো একটি বাদ্যযন্ত্র। বৃষ্টিধারার সুরে আর মেঘ মৃদঙ্গের তালে প্রকৃতি জুড়ে এ যেন তাল, মাত্রা, লয় আর ছন্দের খেলা।

আমরা সংগীতের আরও কিছু উপাদান সম্পর্কে জানব।

এবার জানব সংগীতে তাল, মাত্রা, লয় আর ছন্দ কাকে বলে:

তাল: তাল শব্দের উৎপত্তি তালি থেকে। মাত্রার ছন্দবদ্ধ সমষ্টিকে বলে তাল। যেমন– কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি।

লয়: সংগীতে গতিকে বলে লয়। লয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়– ১) বিলম্বিত লয় ২) মধ্যলয় ৩) দ্রুতলয়।

মাত্রা: সংগীতে গতি বা লয় মাপার একককে বলে মাত্রা। যেমন– এক মাত্রা, দুই মাত্রা, তিন মাত্রা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি মাত্রার মধ্যবর্তী ব্যবধান সমান হয়।

ছন্দ: নিয়মবদ্ধ মাত্রার সমাবেশই ছন্দ।

বর্ষায় আকাশের রূপটা কেমন হয় বলো তো? কখনো কালো মেঘে ঢাকা তো আবার কখনো মেঘের ফাঁকে একটু আলোর হাসি। এ যেন আমাদের মুখেরই প্রতিচ্ছবি। আনন্দ, কষ্ট, হাসি, কান্নাসহ নানা রকম অনুভূতি যেমন আমাদের মুখের ভাবে প্রকাশ পায়, বর্ষার আকাশটিও যেন তেমন। আমরা এবার জানব–বিভিন্ন রকমের ভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত নাচের উপাদানগুলো কী কী–

রস এবং মুদ্রা নাচের দুটি উপাদান।

রস: মুখভঙ্গির মধ্য দিয়ে অনুভূতির প্রকাশকে নাচের ভাষায় বলে রস।

নিচের মুখভঙ্গির ছবিগুলো দেখে রস সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারি–

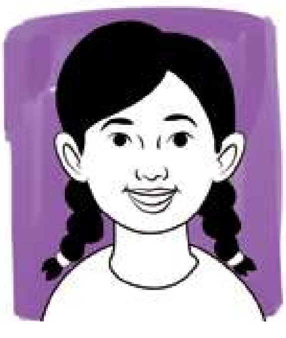

মুদ্রা: হাতের আঙুলের সাহায্যে অর্থবহ কোনো কিছু দেখানো বা বোঝানোকে বলে মুদ্রা ।

নিচের ছবিগুলো দেখে আমরা হস্তমুদ্রা সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারি–

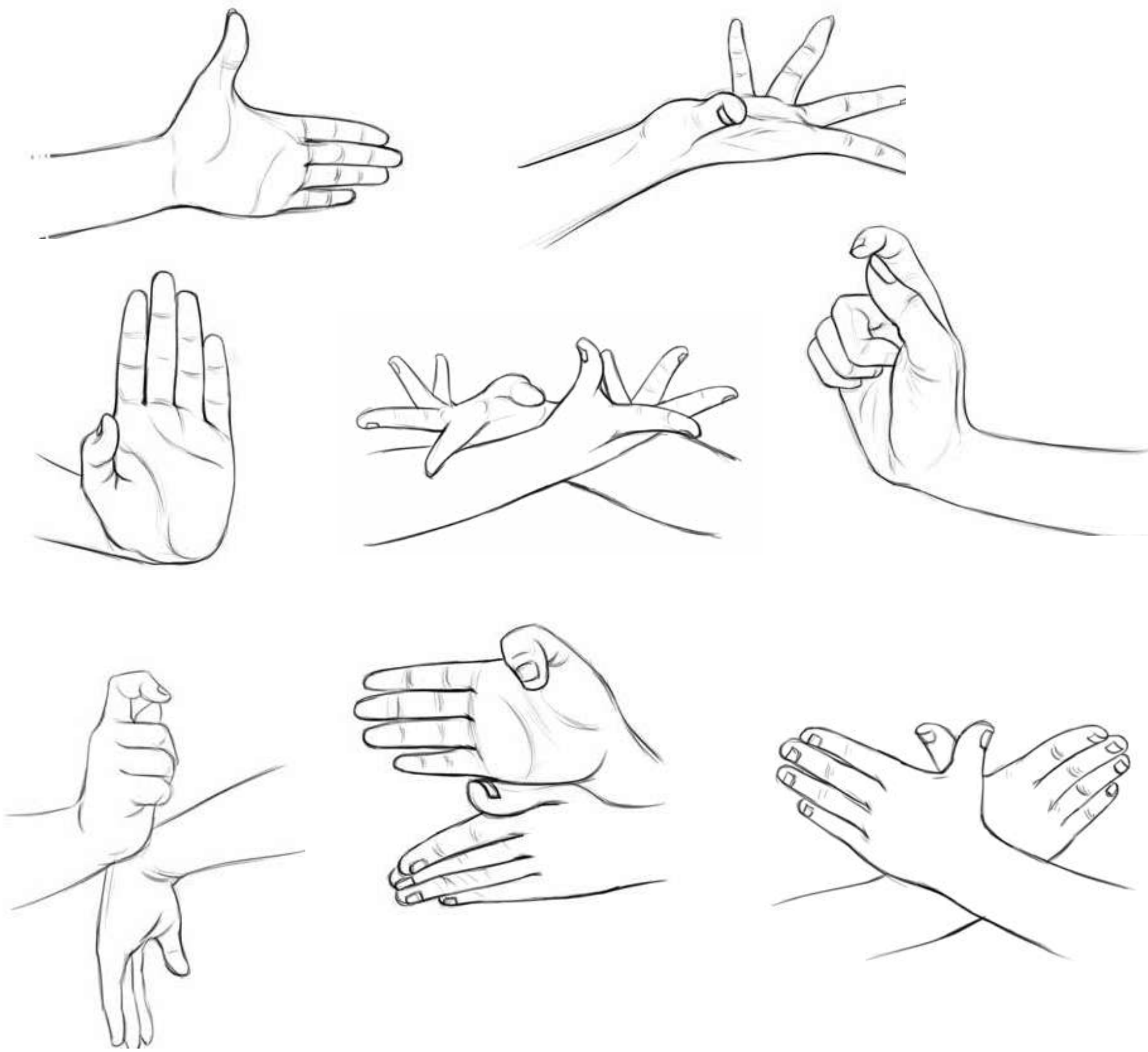

কালচে নীল রঙে ছেয়ে থাকে বর্ষার আকাশটা। তার মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কোনাকুনি রেখার মতো অবিরত ঝরে পড়ে। তোমরা কি জানো, নীল রং হলো একটি মৌলিক রং? অন্য দুটি মৌলিক রং হলো লাল আর হলুদ। পূর্বে 'পলাশের রঙে রাঙানো ভাষায়' আমরা দেখেছিলাম প্রকৃতি জুড়ে লাল রঙের ফুলের মেলা। বর্ষার গাঢ় নীল রঙের আকাশের পরে আমরা দেখতে পাব শরতের উজ্জ্বল নীল আকাশ আর হেমন্তে দিগন্ত জোড়া পাকা ধানের সোনালি হলুদ রং। রংকে আবার বর্ণ বলা হয়ে থাকে। সব বর্ণ মিলে একটা বর্ণচক্র হয়। তোমরা কি জানো, বর্ণচক্র কে আবিষ্কার করেছিলেন? বিজ্ঞানী নিউটন বর্ণচক্র আবিষ্কার করেছিলেন। এবার আমরা ছবি আঁকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রং/বর্ণ,পরিসর সম্পর্কে আরেকটু জানব।

রং আর পরিসর হল ছবি আঁকার আরও দুটি উপাদান–

রং (Colour): রং এর উৎস হল আলো। আলো কোনো বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের দৃষ্টিতে যে বর্ণ অনুভূতি তৈরি করে তাকে রং বলে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রং দু'রকমের– প্রাথমিক ও মিশ্র। লাল, নীল, হলুদ তিনটি হলো প্রাথমিক রং। দুই বা ততোধিক প্রাথমিক রং মিলে হয় মিশ্র রং।

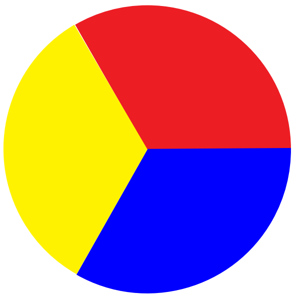

প্রাথমিক বর্ণচক্র

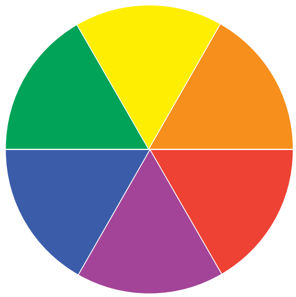

দ্বিতীয় স্তরের বর্ণচক্র

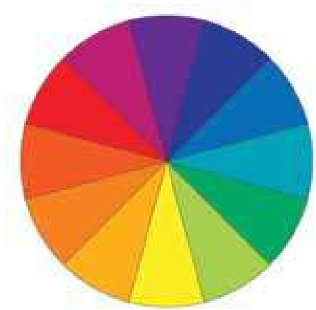

তৃতীয় স্তরের বর্ণচক্র

পরিসর (Space): যে তলের উপর ছবি আঁকা হয় তাকে পরিসর বলে। যেমন–কাগজ, ক্যানভাস, বোর্ড, দেয়াল ইতাদি। তাছাড়া আকার-আকৃতির চারপাশের সীমানা এবং মধ্যবর্তী দূরত্বকেও বলে পরিসর। পরিসর দু'রকমের যথা– ধনাত্মক (positive) , ঋণাত্মক (negative)।

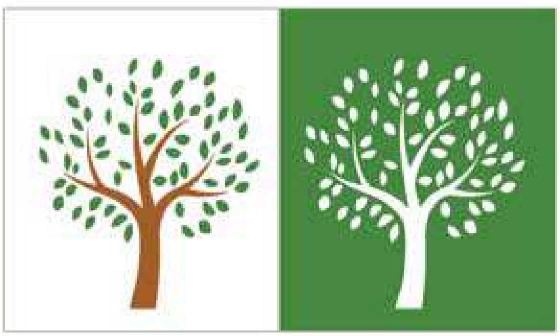

প্রাকৃতিক আকার-আকৃতি দিয়ে ধনাত্মক (positive), ঋণাত্মক (negative) পরিসর।

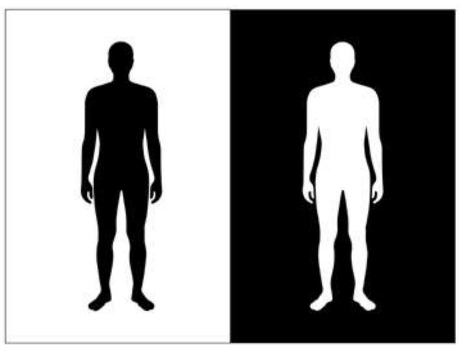

ফিগার দিয়ে ধনাত্মক (positive), ঋণাত্মক (negative) পরিসর।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষার আগমনে নদীগুলো পানিতে ভরে গিয়ে দুকূল উপচে পড়ে। ডুবে যায় ফসলের মাঠ। নষ্ট হয় ফসল। তবে নদীগুলো বয়ে নিয়ে আসে নতুন পলিমাটি। নতুন মাটিতে নতুন স্বপ্ন বোনে কৃষক। অঞ্চলভেদে চলে গানের আসর। নৌকায় চড়ে বেড়াতে যায় গ্রামের বধূ।

আবহমান বাংলার এ দৃশ্যগুলো যুগে যুগে উঠে এসেছে শিল্পীর তুলিতে, কণ্ঠে আর কবি-লেখকদের কলমে। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শুনতে শুনতে আমরাও প্রাণ খুলে গাইতে পারি বর্ষার কোনো গান। অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি বৃষ্টির চঞ্চল রূপটিকে। মনের মতো আঁকতে পারি বর্ষার কোনো ছবি।

বর্ষা উৎসব

বর্ষার রূপ-সৌন্দর্য দেখে রচিত হয়েছে অনেক সাহিত্যকর্ম। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বর্ষাকে 'চঞ্চলা মেয়ের' সাথে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সব ঋতুর মধ্যে বর্ষার গান লিখেছেন সবচাইতে বেশি। আমরা জানি, বাংলা বর্ষপঞ্জির তৃতীয় ও চতুর্থ মাস আষাঢ় ও শ্রাবণ জুড়ে হয় বর্ষা ঋতু। বর্ষায় নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় বর্ষার উৎসব, 'যা বর্ষামঙ্গল' বলেও পরিচিত। বর্ষার গান, কবিতা, নাচ, নাটক, আঁকা ছবি দিয়ে আয়োজন করা যায় বর্ষা উৎসব।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- বর্ষার গান গাইতে, কবিতা আবৃত্তি করতে পারি।
- পছন্দের গানের সাথে আমাদের অনুভূতি, আনন্দ, কষ্ট, হাসি, কান্নাসহ নানারকম অনুভূতি নাচের রস ও মুদ্রায় প্রকাশ করতে পারি।
- বর্ষার প্রকৃতি দেখে ছবি আকঁতে পারি।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে পারি যেখানে প্রিয় বন্ধুকে উপহার দিব স্বপ্নবৃক্ষ।

আমরা এরই মধ্যে জেনেছি, গাছ আর পরিবেশের মধ্যে রয়েছে গভীর বন্ধুত্ব। গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই যত বেশি গাছ লাগাব, ততই পরিবেশ বাঁচবে সাথে আমরাও বাঁচব। গাছ আর পরিবেশের এই নিবিড় বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে দেশে প্রতি বছর ৫ই জুন পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও শুরু হয় জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান।

চলো, গাছ নিয়ে এবার এক মজার খেলা করা যাক। পরিবেশ বাঁচাতে গাছ লাগানোর এই অভিযানে আমরাও অংশ নেব এই খেলার মধ্য দিয়ে। এই খেলার নাম দিলাম 'সবুজের স্বপ্ন পাখায়'।

এই অধ্যায়ে আরও যা করব–

- ‘সবুজের স্বপ্ন পাখায়’ খেলাটিতে আমরা বন্ধুদের উপহার দিব চারা গাছ এবং সাথে আমরা আমাদের একটি স্বপ্নের কথাও লিখে দেব।
- কাজটি করার জন্য প্রথমে আমরা পছন্দমতো একটি ফুল, ফল অথবা ঔষধি গাছের চারা জোগাড় করব। প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে অথবা বীজ থেকে চারা তৈরি করে অথবা পছন্দের গাছে কলম করে কিংবা নার্সারি থেকেও চারাটি জোগাড় করতে পারি।
- মাটির হাঁড়ি, কাপ-বাটি/প্লাস্টিকের বোতল/পাত্রসহ ইত্যাদি যেকোনো ফেলনা জিনিস দিয়ে গাছটির জন্য একটি টব তৈরি করব। টবটির গা পছন্দমতো নকশা করে সাজাব । এবার গাছের উপযোগী মাটি দিয়ে টবটি ভরাট করে তাতে চারাটি লাগাব।
- কাপড় অথবা মোটা শক্ত কাগজ দিয়ে নকশা করে একটি ব্যাগ বানাব, যার মধ্যে আমরা স্বপ্নবৃক্ষের চারাটি বহন করতে পারি।

- এবার স্বপ্ন লেখার পালা। সুন্দর একটি কাগজে নিজের একটি স্বপ্ন লিখে তা আমরা গাছের ব্যাগটির ভেতরে রেখে দিব।

- এরপরে নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণিকক্ষে আয়োজন করব 'সবুজের স্বপ্ন পাখায়' অনুষ্ঠানটি। শ্রেণিকক্ষটি সাজাব বর্ষার আঙ্গিকে। তারপর শুরু করব সে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নবৃক্ষ বিনিময়ের পর্ব। প্রথমে সহপাঠীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাব এবং প্রত্যেকটি দলের নামকরণ করব বর্ষার বিভিন্ন ফুলের নামে। এরপর লটারির মাধ্যমে ঠিক করব, দলের মধ্যে কে কার সঙ্গে স্বপ্নবৃক্ষ আর লিখিত স্বপ্নটি বিনিময় করব।

- উপহার পাওয়া স্বপ্নবৃক্ষটিকে আমরা আগলে রাখব পরম যত্ন আর মমতায়। কারণ এটি শুধু একটি চারা গাছ নয়; বন্ধুর দেয়া তার স্বপ্ন যা প্রতিদিন একটু একটু করে বেড়ে উঠবে চারা গাছটির সাথে। চারা গাছটিকে পছন্দের জায়গায় নিরাপদে স্থাপন করে তাতে নিয়মিত পানি ও সার দেয়ার ব্যবস্থা করব।
- গাছের নতুন পাতা গজানো, ফুল ফোটা, তাতে মৌমাছি, ফড়িং, পাখির উড়ে এসে বসা, কিচির মিচির বা সুর করে তার ডাকা অথবা গাছটিকে কেন্দ্র করে যদি আরও কোনো গল্প তৈরি হয় তার সবকিছু ধারাবাহিকভাবে এঁকে বা লিখে রাখব বন্ধুখাতায়।

স্বপ্নবৃক্ষটির বেড়ে ওঠার দিনলিপি, আঁকা ছবি, যদি সম্ভব হয় বড়দের সাহায্য নিয়ে মোবাইলে ধারণ করে ছবি, ভিডিও এবং বন্ধুর দেয়া লিখিত স্বপ্নটি আমরা প্রদর্শন করব 'বিজয়ের আলোয় সুন্দর আগামী' বিজয় দিবস উদযাপন ও বার্ষিক প্রদর্শনীতে।

এই অধ্যায়ে ছবি আঁকা, গান, অভিনয় ও নাচের মধ্য হতে নিজের পছন্দের বিষয়ে আমি যা জানলাম তা লিখি–

অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর সাথে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের বক্সে টিক চিহ্ন দিন–

- ☐ শিক্ষকের নির্দেশনার ভিত্তিতে কাজ করেছে।
- ☐ এই পাঠ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছে।
- ☐ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল কাজ করেছে।
- ☐ নিজের কাজ গুছিয়ে করেছে।
- ☐ এই পাঠে -- চর্চা করেছে।
- ☐ এই পাঠে শিক্ষার্থী যে বিষয়টি রপ্ত করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করেছে/প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করেছে।

অভিভাবকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর: তারিখ:

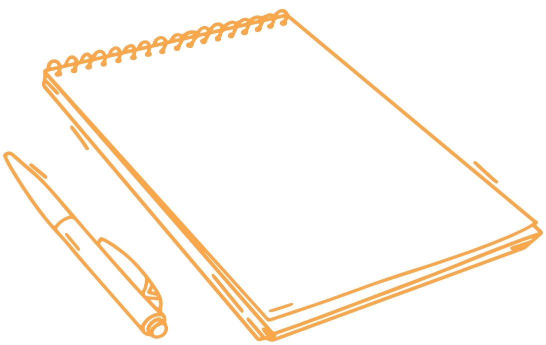

শুধিতে
হইবে
ঋণ

“দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য
দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।”

— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আলোর মশালটিকে যেন নিভিয়ে দেয়া হয়েছে এক নিমেষে। সমগ্র জাতিকে ঘিরে ধরেছে এক নিকষকালো অন্ধকার। জাতির পতাকাটিকে খামচে ধরেছে সে পুরোনো শকুন। স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের ঘৃণিত নীল নকশা অনুসারে রচিত হলো মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কালো অধ্যায়।

১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট রাতে স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের গুলিতে নির্মমভাবে শহিদ হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সেদিন ঘাতকদের বুলেট থেকে রেহাই পায়নি বঙ্গবন্ধুর আদরের পুত্র ১০ বছরের ছোট্ট শিশু শেখ রাসেল পর্যন্ত। বিদেশে থাকায় সেদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা– শেখ হাসিনা আর শেখ রেহানার প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশসহ সমস্ত পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের আলোর মিছিলটিকে সেদিন গ্রাস করেছিল গভীর কালো অন্ধকার। কী অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে বিশ্বমানবতার তা বিশ্বনেতাদের বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল।

শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে,
আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে।

—ফিদেল কাস্ত্রো

আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুম কোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ।

— ইয়াসির আরাফাত

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বাঙলাদেশই শুধু এতিম হয়নি বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান সন্তানকে।

— জেমস লামন্ড

ইস্পাত- কঠিন নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে তিনি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বনেতা হয়ে উঠেছিলেন। তিল তিল করে পলিমাটি দিয়ে যেমন করে তৈরি হয়েছে দেশের এই উর্বর ভূমি, ঠিক তেমন করে নির্ভীক সাহস, অফুরান দেশপ্রেম, অদম্য প্রাণশক্তি আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে টুঙ্গিপাড়ার ছোট্ট খোকাটি হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস। দেশের মানুষের প্রতি বুকভরা ভালোবাসার জন্য তিনি হয়েছিলেন বিশ্ব মানবতার প্রতীক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বজোড়া নিপীড়িত মানুষের মুক্তির অগ্রদূত। তাইতো তিনি বলেছিলেন–

বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত
শোষক আর শোষিত।
আমি শোষিতের পক্ষে।

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শোষিত মানুষের মুক্তির মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে ঘাতকরা চেয়েছিল মুক্তিকামী মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম চিরতরে মুছে দিতে। কিন্তু আমরা জানি কীর্তিমানের মৃত্যু নাই।

যদি রাত পোহালে শোনা যেত
বঙ্গবন্ধু মরে নাই!
যদি রাত পোহালে শোনা যেত
বঙ্গবন্ধু মরে নাই!
যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো
বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই,
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।
তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা।
আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই কালজয়ী গানটি রচনা করেছেন- হাসান মতিউর রহমান, গানটিতে সুর দিয়েছেন- মলয় কুমার গাঙ্গুলী এবং তিনিই প্রথমে গানটি পরিবেশন করেন, পরে গানটি গেয়েছেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী- সাবিনা ইয়াসমিন।

এই গানটির কথাগুলোর মধ্য দিয়ে যেন প্রকাশ পেয়েছে আমাদের সকলের মনের কথা। বাংলার মুক্তিকামী মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে কোনোদিন মুছে ফেলা যাবে না। তাইতো শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে চলার দৃপ্ত শপথ নিতে আমরা প্রতি বছর ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোকদিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করি।

এবার শোকের মাসে শোকের রং সম্পর্কে আমরা একটু জানব–

মৌলিক আর মিশ্র রং সম্পর্কে আমরা জেনেছি এর আগের পাঠে। বর্ণচক্রের মাধ্যমে দেখেছি কোন কোন রং মিলে কী রং তৈরি হয়। আমরা বর্ণচক্রে কালো অথবা সাদা রঙের কোনো উপস্থিতি দেখতে পাইনি। তাহলে কালো আর সাদা আসলে কী? চলো জেনে নিই এ সম্পর্কে–

সাদা: আলোর উপস্থিতি হলো সাদা। সূর্যের আলোর সব রং মিলে তৈরি করে সাদা রং। ছবি আঁকার জন্য আমরা যে সাদা রং পাই তা আসলে সাদা রঞ্জক পদার্থ। সাদা রং শান্তি ও বিশুদ্ধতার প্রতীক।

কালো: আলোর অনুপস্থিতি হলো কালো। তবে ছবি আঁকার জন্য সাদা রঙ এর ন্যায় কালো রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। কালো রং হলো শোকের প্রতীক ।

আমরা যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি–

- ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যবই– বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানব।
- পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আমরা ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে পারি।

আমরা যা করব–

- শোকের রং কোনটি তা জানব এবং তা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখব।
- বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবস নিয়ে নিজের মতো ছবি আঁকতে পারি।
- শোক দিবসের বিভিন্ন গান শুনে সেখান থেকে সংগীতের লয়, মাত্রা, তাল আর ছন্দ বুঝতে পারি।
- কেউ চাইলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গান, কবিতা পরিবেশনের জন্য একক ও দলগতভাবে অনুশীলন করতে পারি।
- ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবসে স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমরা একটি কাজের পরিকল্পনা করব।

- শোকের প্রতীক হিসেবে ব্যাজ তৈরি ও পরিধান: ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আমরা কালো রঙের কাগজ অথবা কাপড় জ্যামিতিক আকারে কেটে নিয়ে সহজে শোকের প্রতীক হিসেবে কালো ব্যাজ তৈরি করে নিজেরা পরব এবং পরিবারের সদস্য, স্কুলের সহপাঠী ও শিক্ষকদেরও পরিয়ে দিব।

- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনী ও উপস্থাপনার আয়োজন করতে পারি। সেজন্য দলগত অভিনয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবসের মূলভাবকে নিজেদের মতো সহজ সরলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি।
- বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোরের উপর ভিত্তি করে বন্ধুখাতায় একটি গল্প লিখতে পারি।

জাতির পিতা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলে মানুষের মুখে সুখের হাসি ফোটাতে। তাঁর আদর্শকে বুকে ধারণ করে, সোনার বাংলাদেশ গড়ার দৃপ্ত শপথ নেব আমরা। এইভাবে সম্মান জানাব স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মৃতির প্রতি।

এই অধ্যায়ে আমার অনুভূতি লিখি–

সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে
শরৎ আসে আমার দেশে।
নীল সাদা জামা গায়ে,
লুকোচুরি খেলা খেলে,
মেঘবাদল আর রৌদ্রছায়ে।

তোমরা কি খেয়াল করেছ এর মাঝে আকাশটা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল নীল রঙের। তার মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা। এ সময়ে ভোরের বেলা ঘাসের ডগায় থাকা শিশিরে পা ভিজিয়ে বুঝতে পারি শরৎকাল এসে গেছে। বাংলা বর্ষপঞ্জিটি দেখে নেয়া যাক। আমরা তো জানি, ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুমাস শরৎকাল। ইংরেজি আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত শরৎকাল স্থায়ী হয়।

আমরা এরই মধ্যে জেনেছি যে, নীল একটি মৌলিক রং। এই নীল আকাশের সাদা মেঘগুলো কত রকমের আকৃতি বদলায়! কখনো ঘোড়া কখনো গাছ কখনো হাতি তো আবার কখনো মানুষের আকৃতির মতো। আকাশের এলোমেলো মেঘগুলোতে নিজের পছন্দের কিছু খুঁজে পাও কি না দেখো তো!

আমরা আকাশটাকে ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখব, কিছু দিন পরপরই আকাশ তার রূপ পরিবর্তন করছে। আকাশের মাঝে নানান রং খেলা করে। এই রং ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতিতে। এর প্রভাব দেখা যায় রূপসি বাংলার রূপেও। একেক সময়ে বাংলা মায়ের একেক রূপ ধরা পড়ে আমাদের চোখে।

এই অধ্যায়ে যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি—

- শরতের প্রকৃতি দেখে, শুনে ও অনুভব করে প্রকৃতির মধ্য থেকেই ছবি আঁকার উপাদান আলো-ছায়া ও বুনটের ধারণা পেতে পারি।
- শরতের প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে আমাদের অনুভূতি আনন্দ, কষ্ট, হাসি, কান্নাসহ নানারকম ভঙ্গি সম্পর্কে জানতে পারি।

শরৎ হলো স্নিগ্ধতা ও কোমলতার প্রতীক। বর্ষার গাঢ় রঙের মেঘ কেটে গিয়ে শরতের আকাশ হয়ে উঠে ঝকঝকে। শরতের প্রকৃতি জুড়ে চলতে থাকে আলোছায়ার খেলা। শরতের মসৃণ নীল আকাশের গায়ে নরম সাদা মেঘ যেন বুনে চলে রূপকথার গল্প। এবার আমরা আরো কিছু ছবি আঁকার উপাদান সম্পর্কে জানব—

মান ও বুনট ছবি আঁকার আরো দুটি উপাদান–

মান (Value): ছবিতে আলো-অন্ধকারের তারতম্যকে মান (Value) বলে। রংকে হালকা থেকে গাঢ় করার মধ্য দিয়ে আলো-অন্ধকার প্রকাশ করা হয়। ছবিতে হালকা রং দিয়ে আলো (light tone) আর গাঢ় রং দিয়ে অন্ধকার (dark tone) বুঝানো হয়। তাছাড়া সাদা আর কালো রং মিশিয়ে তৈরি ছাই রঙের মাধ্যমে ছবিতে মধ্য (middle tone) তৈরি করা হয়।

বুনট (Texture): কোনো বস্তুর পৃষ্ঠের গুণমানকে বুনট বলে। বুনটকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন– রুক্ষ, মসৃণ, নরম ও কঠিন।

রুক্ষ

মসৃণ

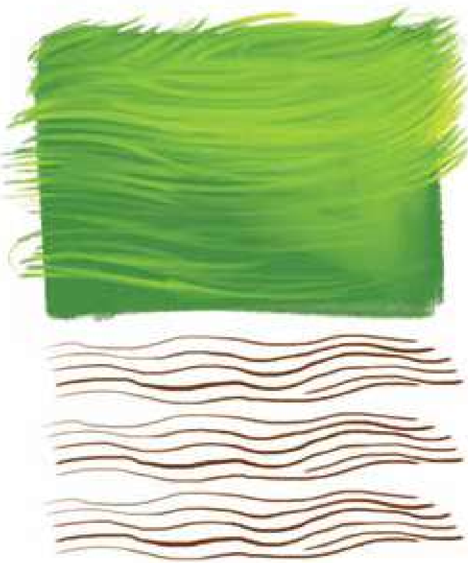

নরম

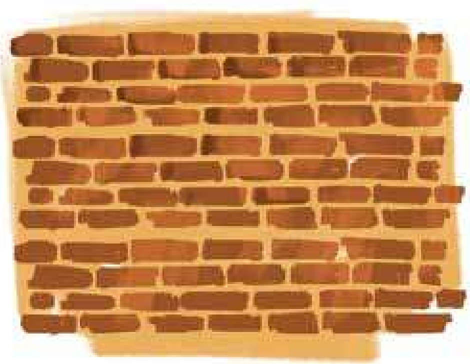

কঠিন

এ সময়ে আকাশের বুকে উড়ে বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে বক। খালে-বিলে দেখা যায় লাল সাদা শাপলা ফুল। নদীর দুই ধারের কাশবনে আসে নতুন প্রাণ। হালকা বাতাসে দুলে দুলে ওঠে কাশবন, যেন এক অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমা। নদীর বুকে ভাসে সারি সারি পালতোলা নৌকা। আর দূর থেকে ভেসে আসে মাঝি-মাল্লারের কণ্ঠের গান। আমরা আগের পাঠে জেনেছিলাম মাত্রা সম্পর্কে। এবার জানব কেমন করে স্বরের সঙ্গে মাত্রার বন্ধুত্ব হয়।

১ মাত্রা

সা । রে । গা । মা । পা । ধা । নি

২ মাত্রা

সা সা । রে রে । গা গা । মা মা । পা পা । ধা ধা । নি নি

৩ মাত্রা

সা সা সা । রে রে রে । গা গা গা । মা মা মা । পা পা পা । ধা ধা ধা । নি নি নি

৪ মাত্রা

সা সা সা সা । রে রে রে রে । গা গা গা গা । মা মা মা মা । পা পা পা পা । ধা ধা ধা ধা । নি নি নি নি

এ অধ্যায়ে যা করতে পারি–

- শরতের আকাশের রং, মেঘের ভেসে বেড়ানো, কাশবন, কাশফুল, ফুটন্ত শাপলা, বক এইসব সম্পর্কে আমরা বন্ধুখাতায় লিখে অথবা এঁকে রাখব।
- মেঘের ভেসে যাওয়া, পাখির উড়ে চলা, গাছের দোলার বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে হাতের ভঙ্গিমার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।
- বইতে দেয়া কাব্যনাটিকায় অভিনয়ের প্রস্তুতি নেব।
- কাব্যনাটিকায় অভিনয় করব।

শরৎকালের রূপবৈচিত্র্য দেখে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, তার সঙ্গে নিজস্ব ভাবনাকে মিলিয়ে একটা নতুন কিছু তৈরির চিন্তা করতে পারি। মনে আছে, আমরা এর আগে কী করেছিলাম? আমরা আঙুলের পাপেট বানিয়েছিলাম। এবার আমরা দুটো হাতকে ব্যবহার করে পুতুল তৈরি করব। হাতের বিভিন্ন ভঙ্গিমার মাধ্যমে কোনো কিছু পরিবেশনের প্রস্তুতি নিলে কেমন হয় বলো তো? হুম, দারুণ মজার একটা কাজ হবে তাই না!

রাফি

স্কুলে যায় রাফি রোজ সকালে
হেসে খেলে সদলবলে।
আজ ঘুম ভেঙেছে তার বেলা করে
দ্যাখে, আগেই সবাই গেছে চলে।
তাই তো চলছে একা একা
সাথে নেই কোনো বন্ধু সখা।

হাঁটছে রাফি আপন মনে, তাকায় সে নদীর পানে।
ছুটছে মাঝি গুন টেনে, ভাটিয়ালি গানের তানে।

রাফি : ও মাঝি ভাই, যাচ্ছ কোথায়?
মাঝি : উত্তরের ঐ শ্যামল গাঁয়, নাইওর নিয়ে চললাম হেথায়।
রাফি : যাও, তবে চলছ যেথায়।
হঠাৎ একদল বকপাখি করছে এমন ডাকাডাকি
কাছে গিয়ে বলে রাফি দুই আঙুলে বাজিয়ে তুড়ি
রাফি : করছ কেন এত হুড়োহুড়ি?
বক : ওমা তুমি বলছ এ কী!
মন দিয়ে শোনো কথাটি,
আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলি, মাছ ধরি আর সাঁতার কাটি।

রাফি : ফিরে যাবে কখন ঘরে?
বক : বেলা যখন যাবে পড়ে।

খোকা : তুমি এখন যাওগো ফিরে।
রাফি, নদীর ধারে দাঁড়াল আসি
অমনি কাশবন উঠল হাসি।
সেজেছে সে সাদা ফুলে, একটু বাতাসেই উঠছে ঢলে।
কাশবন : দূরে কেন তুমি কাছে এসো,
একটুখানি ছায়ায় বসো।
হবে তুমি আমার বন্ধে
মনখানি দুলিয়ে নাও আমার ছন্দে।
রাফি, একটুখানি বসল ছায়।
হঠাৎ চোখ যায় আকাশের গায়,
নীল আকাশের এক কোণ জুড়ে
একখানা সাদা মেঘ আসল উড়ে।

রাফি : ও মেঘ, একটুখানি দাঁড়াবে ভাই?
চলছ কোথায়? জানতে চাই।
কথা শুনে দাঁড়াল সে, একটু পেছনে আসল ভেসে।
ফিক করে দিলো হেসে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরল শেষে।
ভিজিয়ে দিয়ে উড়ে চলল পাখির বেশে।
রাফিও চলল স্কুলের দিকে
পায়ে পায়ে সরে সরে রোদ-ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে।

পোশাক ও সাজসজ্জা–

পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং চরিত্রের অলঙ্করণে পোশাক, সাজসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি হলো নাচ এবং অভিনয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

চলো, উপরের কাব্যনাটিকাটি নিয়ে একটা কাজ করা যাক। আমরা নিজেরাই যদি চরিত্রগুলো হয়ে যাই তো কেমন হয়!

- এবার আমরা কয়েকটি ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে যাই। তারপর নাটিকাটি কয়েকবার পড়ি। দেখি তো কয়টি চরিত্র আছে?
- আমরা নিজেরাই চরিত্রগুলো হয়ে নাটিকাটি চর্চা করব। তবে মনে রাখতে হবে, এটা আমরা করব হাত-পুতুলের মাধ্যমে অথবা হাতে ভঙ্গিমার মাধ্যমে।
- আমরা প্রথমেই পায়ের পুরোনো মোজা নেব অথবা একটু বড়ো কাপড়ের টুকরো/যেকোনো কাগজ কিংবা খালি হাত দুটোও ব্যবহার করতে পারি। এখন সেই মোজায়/কাপড়ে/কাগজে অথবা খালি হাতে বিভিন্ন রঙের সুতো/টুকরো কাগজ/দড়ি/বোতাম/গাছের পাতা/ডাল/ফুল/ফেলনা জিনিস ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র তৈরি করব। এবার সেই চরিত্র অনুযায়ী গলার স্বর পরিবর্তন করে কথা বলব, শব্দ করব, ভঙ্গি করব।

এই অধ্যায়ে আমার অনুভূতি লিখি–

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর সাথে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের বক্সে টিক চিহ্ন দিন-

- ☐ শিক্ষকের নির্দেশনার ভিত্তিতে কাজ করেছে।
- ☐ এই পাঠ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছে।
- ☐ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল কাজ করেছে।
- ☐ নিজের কাজ গুছিয়ে করেছে।
- ☐ এই পাঠে -- চর্চা করেছে।
- ☐ এই পাঠে শিক্ষার্থী যে বিষয়টি রপ্ত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করেছে/প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করেছে--

অভিভাবকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর: তারিখ:

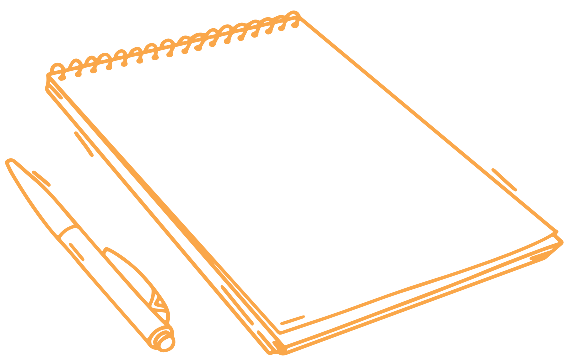

হেমন্ত রাঙা সোনা রঙে

হেমন্ত মানেই শিশির ভেজা মনোমুগ্ধকর এক সকাল। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ দুটি মাস পেলেও হেমন্ত খুবই সংক্ষিপ্ত একটি ঋতু। শুরুটা মিশে থাকে শরতের উজ্জ্বল উষ্ণতায়, শেষটা চলে যায় শীতের হিমশীতলে। পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের কবিতার মতোই আমরা দেখতে পাই হেমন্ত ঋতুকে

আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল খেতের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাহিছে কে যেন হল্‌দি-কোটার গান।
ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমীলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায়।
আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
মাঝে মাঠখানি চাদর বিছায়ে হলুদ বরন ধানে।

হেমন্ত ঋতুতে গ্রামবাংলার প্রান্তর জুড়ে থাকে ধানের ক্ষেত। পাকা ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় শীতের আগমনী বাতাস। ভেসে আসা ধানের গন্ধে ভরে ওঠে আমাদের মন। তোমরা কি জানো এ ফসল কারা ফলায়?

কিষাণ-কিষাণি অনেক পরিশ্রম করে এ ফসল ফলায়। প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি প্রস্তুত করা, চারা রোপন, পানি সেচ দেয়া, সার দেয়া, আগাছা পরিষ্কার করা ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করে কিষাণ-কিষাণি সবুজ ধানের চারা বড়ো করে। তারপর চারা গাছগুলো একসময় পেকে হলুদ হয়। দেখে মনে হয় হলুদ চাদর বিছানো মাঠ।

এই সোনালি পাকা ধানের ক্ষেতে ভিড় করে নানা পাখ-পাখালি। আর এ সময়ে পশু-পাখি যেন ফসলের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যে কৃষক ক্ষেতে বসায় মানুষের আদলে বানানো কাকতাড়ুয়া। বাঁশ, পুরানো কাপড়, খড়, মাটির পাতিল দিয়ে তৈরি করা হয় ‘কাকতাড়ুয়া’। তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই দেখেছ ?

এই অধ্যায়ে আমরা যেভাবে অভিজ্ঞতা পেতে পারি—

- হেমন্তের প্রকৃতি দেখে, শুনে ও স্পর্শ করে অভিজ্ঞতা নিতে পারি।
- ছবি ও ভিডিও দেখে বা অডিওতে গান, কবিতা শুনে অভিজ্ঞতা নিতে পারি।
- হেমন্তের প্রকৃতি দেখে ছবি আঁকার উপাদান হিসেবে 'হলুদ' রঙ সম্পর্কে জানতে পারি।

আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত যা ধান থেকেই পাই। পাকা ধানের রং হলুদ। সূর্যের আলোর তারতম্যে তা আমরা সোনালি রঙের দেখি।

পাকা ধানের 'হলুদ' রং হলো আমাদের প্রাথমিক তিনটি রঙের একটা। লাল, নীল ও হলুদ এই তিনটি হলো প্রাথমিক রং। আমরা 'পলাশের রঙে রাঙানো ভাষা'য় 'লাল' রং, 'বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে' ও 'শরৎ আসে মেঘের ভেলায়' তে 'নীল' এবং এই পাঠে হলুদ রং সম্পর্কে জানলাম।

নবান্নের আনন্দে আমন ধান ঘরে নেওয়ার ব্যস্ত সময় পার করে কৃষক। কৃষক কাস্তে দিয়ে ধান কেটে, আঁটি বেঁধে, কাঁধে করে কখনো গরুর গাড়ি বা যানবাহনে করে বাড়ির উঠোনে নিয়ে যান। এরপর চলে নতুন ধান মাড়াই, ঝাড়াই, সিদ্ধ করার কাজ।

সমতল ভূমির মতোই পাহাড়ের গায়ে করা হয় নানা ধরনের চাষাবাদ। এ পদ্ধতিকে বলা হয় 'জুম' চাষ। জুম চাষের জন্য প্রয়োজন হয় এক বিশেষ ধরনের দক্ষতা। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের রয়েছে জুম চাষের অসাধারণ দক্ষতা।

এই অধ্যায়ে যা করব–

- কাগজ কেটে/ড্রইং করে/গাছের পাতা/ডাল-পালা দিয়ে কিষাণ-কিষাণির অবয়ব কোলাজ তৈরি করতে/রং করতে পারি বন্ধুখাতায়।
- গাছের পাতা/ডাল-পালা/মাটি/যেকোনো ফেলনা জিনিষ দিয়ে কৃষকের অবয়ব গড়তে পারি।
- এবার বন্ধুখাতায় যে ছবি/নকশা আঁকব তা কিন্তু রঙ করব না, বিভিন্ন রকমের শস্যদানা আঠা দিয়ে লাগিয়ে তা পূর্ণ করব । ছবির বিষয়বস্তু কিন্তু হেমন্তকে নিয়ে হতে হবে। এই জন্য চলো আমরা হেমন্তে কী কী পেলাম তার একটা তালিকা করে ফেলি।
- সেই তালিকা থেকে ছবির বিষয়বস্তু বেছে নিতে হবে। যেমন– কৃষাণ– কৃষাণির অবয়ব/কৃষি কাজে ব্যবহৃত নানা উপকরণ যেমন– কাস্তে/মাথাল (মাথার টুপি), লাঙ্গল/কাকতাড়ুয়া/ডালা/কুলা ইতাদি।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি শিল্পকর্ম 'ফসল মাড়াই' ১৯৬৩

আমাদের ঘরের কাজে যেমনভাবে কুলা, চালুনি, ঝাড়ু লাগে তেমনিভাবে নতুন ধান মাড়াই, ঝাড়াই, সেদ্ধ, শুকানোতে প্রয়োজন হয় ডালা, কুলা, চালুনি, ঝাঁটা, চাটাই ইত্যাদি। আমরা কি জানি এগুলো বাঁশ ও বেতের তৈরি? এগুলোকে হস্তশিল্প বা বাঁশ ও বেতের শিল্পও বলে।

হেমন্তে পাকা ধান কেটে মাথায় করে নিয়ে আসা, ধান মাড়াই করে রোদে শুকানো—বাংলার এই চিরন্তন রূপ শিল্পীর তুলিতে উঠে এসেছে বারবার।

এখন মেশিনে ধান ভাঙলেও এক সময় ঢেঁকিতে পার দিয়ে ধান থেকে চাল বের করত। বাংলাদেশের কোথাও কোথাও এখনো ঢেঁকি দেখা যায়। পার দেয়ার সময় পায়ে আসে ছন্দময় চলন। ঢেঁকির এই ওঠানামায় তৈরি হয় শব্দ ও ছন্দ। আমরা সেখান থেকে পাই গানের কিছু উপকরণ। মনে লাগে আনন্দের দোলা, গলায় আসে সুর, গাঁয়ের গীত 'ও ধান ভানিরে ঢেঁকিতে পার দিয়া'।

এই অধ্যায়ে আমার অনুভূতি লিখি–

১৯৭১ সাল। হেমন্তের বিদায় বেলা। মুক্তিবাহিনী বিপুল বিক্রমে এগিয়ে চলেছে বিজয়ের পথে। এদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে বেছে নেয় ষড়যন্ত্রের নতুন ঘৃণ্য পথ। বাঙালি ও তাদের স্বপ্নের বাংলা যেন কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে তার জন্যই তারা বেছে নেয় এক বিধ্বংসী পথ। বিশিষ্ট ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পীদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৪ই ডিসেম্বর এক অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হয় বাংলাদেশের। সেই শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির সম্মানে ঢাকার রায়েরবাজারে নির্মিত হয়েছে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ। ১৪ই ডিসেম্বর আমাদের দেশে পালিত হয় 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস'।

সকল শহিদ বুদ্ধিজীবীর স্মরণে আমরা যা করতে পারি–

- বুদ্ধিজীবী দিবস সম্পর্কে অথবা যেকোনো শহিদ বুদ্ধিজীবীর কাজ সম্পর্কে যেকোনো মাধ্যম থেকে জেনে তা উপস্থাপনের জন্য তৈরি করব।

জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময়

-গাজী মাজহারুল আনোয়ার

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, শিশু-কিশোর ও নারীর আত্মত্যাগ- আত্মদানের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত বিজয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনী। এই দিনটিকে আমরা অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে পালন করি আমাদের মহান বিজয় দিবস হিসেবে। প্রতিবছর এই দিনে আমরা শপথ করি এক সুন্দর নতুন আগামী গড়ার। দেখতে দেখতে আমরা বছরের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। পুরো বছর জুড়ে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছি। এবার সময় হয়েছে এই সমস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে করা আমাদের কাজগুলোকে একত্র

শিল্পী নিতুন কুন্ডু ও শিল্পী প্রাণেশ কুমার মন্ডলের আঁকা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন দুটি পোস্টার।

করার। এ পর্যায়ে আসন্ন মহান বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে আমরা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করব। আমরা এই প্রদর্শনীর নাম দেব 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে'।

প্রদর্শনী আয়োজনের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সারা বছর জুড়ে করা আমাদের কাজগুলোকে একত্র করব এবং দুটি ভাগে ভাগ করে নেব। একটি হলো দৃশ্যশিল্প বিষয়ক এবং অন্যটি হলো পরিবেশনাশিল্প বিষয়ক। এই দুটি বিষয়েরই যা যা কাজ আমরা এ পর্যন্ত করেছি, সেসব কাজ নিয়ে এবং প্রদর্শনীর বিভিন্ন দিক ও উপায় নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় একটি পরিকল্পনা তৈরি করব।

দৃশ্যশিল্পের যে যে বিষয় আমরা চাইলে প্রদর্শনীতে রাখতে পারি তার একটি সম্ভাব্য তালিকা হলো:

- বন্ধুখাতা
- বন্ধুখাতার বাইরে করা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাভিত্তিক কাজ, যেমন: বড়ো কোনো কোলাজচিত্র, মানচিত্র, পোস্টার, খুঁজে পাওয়া জিনিস বা মাটি কিংবা প্রাকৃতিক কোনো উপাদান দিয়ে তৈরি বিভিন্ন গড়ন।
- 'সবুজের স্বপ্ন পাখা'তে সহপাঠীর দেওয়া স্বপ্ন বা চিঠি ও সেই চারা গাছটি।
- নির্দিষ্ট পাঠের ভিত্তিতে সংগৃহীত যেকোনো ছবি বা বস্তু।

অন্যদিকে পরিবেশন শিল্পের যে যে বিষয় আমরা চাইলে প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করতে পারি তার একটি সম্ভাব্য তালিকা হলো:

- বছর জুড়ে যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গেছি, তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো গান, যেমন: দেশের গান, প্রকৃতির গান, লোকসংগীত ইত্যাদি।
- পাঠভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কোনো কবিতা আবৃত্তি।
- পাঠভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কোনো নাচ।
- পাপেট শো বা পুতুল নাচ–'পাঁচ আঙুলের ভুবন'।
- 'শরৎ আসে মেঘের ভেলায়' পাঠের পদ্যে রচিত ছোট নাটকটি।
- যেকোনো নির্দিষ্ট পাঠের ভিত্তিতে সংগৃহীত ভিডিও চিত্র বা চলচ্চিত্র।

প্রদর্শনীটি আমরা শ্রেণিকক্ষের ভেতরে কিংবা বাইরেও আয়োজন করতে পারি। বন্ধুখাতাটিসহ অন্য সব শিল্পকর্ম ও উপস্থাপনা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে শিক্ষকের কাছে কাজগুলো জমা দেব ও উপস্থাপনের কথা জানাব এবং সেখান থেকে তিনি যেগুলো বাছাই করে দেবেন শুধু সেগুলো নিয়ে আমরা প্রদর্শনীর আয়োজন করব তাঁরই সহায়তা নিয়ে।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করব।

এই অধ্যায়ে আমার অনুভূতি লিখি–

'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজনে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আল্লারাখা আর ওস্তাদ আলী আকবর খান

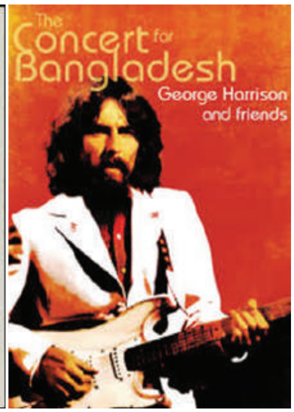

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং ত্রাণ সাহায্যার্থে ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট, রবিবার অপরাহ্ণে 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমেই মূলত বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন সংকটের বার্তা পৌঁছে যায়।
- আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। এ কনসার্টের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ব্রিটিশ সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত সংগীত শিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, জোয়ান বায়েস, বিলি প্রেস্টন, লিয়ন রাসেল, ব্যাডফিঙ্গার এবং রিঙ্গো স্টার ছিলেন উল্লেখযোগ্য। রবিশঙ্কর ও বিখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ আলি আকবর খান যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তাঁদের সাথে তবলায় ছিলেন ওস্তাদ আল্লা রাখা খান।
- এই কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় আড়াই কোটি মার্কিন ডলার যা ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়েছিল।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণি

শিল্প ও সংস্কৃতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য